দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

বিরোধীদের কোনও নরেন্দ্র মোদী নেই। — পৃঃ ১৩

বাংলাদেশে দেবোত্তর ভূমি গ্রাস করে সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণের উদ্যোগ — পৃঃ ৪৩

৭০ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা।। ১৮ জুন ২০১৮।। ৩ আষাঢ় - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

পশ্চিমবঙ্গে

শাসকের সন্ত্রাস

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ৩ আষাঢ়, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১৮ জুন - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

প্রণববাবুর নাগপুর সফর দেশজ কমিউনিস্টদের উলঙ্গ করে সামনে এনেছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

খোলা চিঠি : দিদি হবেন জাতীয়, ভাইয়েরা বিজাতীয় ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কোথায় কী বলবেন তা কি আমরা ঠিক করব? ▯ ধনঞ্জয় মহাপাত্র ▯ ৮

২০১৯-এ কেন নরেন্দ্র মোদীকে আবার ভোট দেবেন? ▯ ড. সুদীপ ঘোষ ▯ ১১

বিরোধীদের কোনও নরেন্দ্র মোদী নেই ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১৩

২০১৯-এর নির্বাচন, আতঙ্কের সংক্রমণ ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৫

পঞ্চায়েত নির্বাচনে কুড়ি হাজার প্রার্থীর আগেই জয়লাভ নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকে গেল ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১৭

মমতার ইন্ধনে রক্তস্নাত পশ্চিমবঙ্গ ▯ সুব্রত চট্টোপাধ্যায় ▯ ২৩

অম্বুবাচী : নববর্ষা বরণ ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

চিরঞ্জীবী মার্কণ্ডেয় ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩৩

গল্প : কাঁটাতারের ওপার থেকে ▯ বিরাজ নারায়ণ রায় ▯ ৩৫

আমার দেখা কর্মবীর : স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দ পোদ্দার ▯ বিদ্রোহী কুমার সরকার ▯ ৪৩

মাকুর মতো সেকুও এখন গালাগালি ▯ নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ এইসময়, সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ চিত্রকথা : ৪০ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪৯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সব খেলার সেরা

ফুটবলের সব থেকে বড়ো উৎসব শুরু হয়ে গেছে। অনেকেরই চোখ এখন টিভির পর্দায়। মেসি বড়ো খেলোয়াড় না রোনাল্ডো? জার্মানি ভালো দল না ব্রাজিল? কোচ হিসেবেই বা কে বড়ো, তিতে না সাম্পাওলি? তর্ক জমে উঠেছে দারুণ। এর পাশে চলছে সুনীল ছেত্রীদের নিয়ে আলোচনা। ভারত সম্প্রতি কিনিয়াকে হারিয়ে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে উঠে এসেছে কয়েক ধাপ। সুতরাং ফুটবলের আসর বেশ জমজমাট। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা তাই ফুটবল নিয়ে। লিখবেন জয়ন্ত চক্রবর্তী, জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সঙ্ঘ সবাইকে লইয়াই চলিতেছে

নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানাইবার মুহূর্ত হইতেই কংগ্রেস নামক শতাব্দী প্রাচীন দলটির কতিপয় নেতা-নেত্রী হতাশায় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহারই বশবর্তী হইয়া তাঁহারা বিভিন্নভাবে বয়ানবাজি শুরু করিয়াছিলেন। বস্তুত তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, প্রণব মুখোপাধ্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি হইবার পর তিনি শুধুমাত্র কংগ্রেসের নহে, সমগ্র ভারতবাসীর। পূর্বতন হইবার পরও তিনি সাংবিধানিক ব্যক্তিত্ব এবং দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে। সেই অধিকারের ভিত্তিতেই তিনি নাগপুরে সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন। তাই তিনি পূর্বতন কংগ্রেসি নেতা হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান কংগ্রেস নেতাদের কথামতো আচরণ করিতে বাধ্য নন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ বলিতেছেন যে, নাগপুরের অনুষ্ঠানে কংগ্রেসি নেতারা তাঁহার ভাষণের পূর্বেই বয়ানবাজি করিয়া বড়ই ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের তাঁহার ভাষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই বয়ানবাজি তাঁহাদের হতাশারই নামান্তর ছিল। তাহাদের ভয় হইয়াছিল প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে যাইয়া বৈচারিক পরিবর্তনের শিকার হইবেন না তো!

বস্তুত প্রতি বৎসরই নাগপুরে সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়া দেশের বহু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব আসিয়াছেন সঙ্ঘের বিপরীত মতাদর্শসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও। সঙ্ঘ শিবির দেখিয়াছেন গান্ধীজী, মদনমোহন মালব্য, জয়প্রকাশ নারায়ণ সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি। প্রণব মুখোপাধ্যায় সঙ্ঘের আমন্ত্রণ স্বীকার করিবার পর হইতেই কংগ্রেস, বামপন্থী ও কতিপয় সংবাদমাধ্যম তাঁহাকে নিরুৎসাহিত করিতে প্রয়াস করিয়াছে। বিদগ্ধ পণ্ডিত প্রণব মুখোপাধ্যায় তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া যথারীতি নাগপুর গিয়াছেন এবং সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জন্মভিটা পরিদর্শন করিয়া ভিজিটর্স বুকে লিখিয়াছেন 'ভারতমাতার এক মহান সন্তানকে শ্রদ্ধা জানাইতে নাগপুর আসিয়াছি।'

অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রণব মুখোপাধ্যায় সঙ্ঘের চিন্তাভাবনাকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য সঙ্ঘের আদর্শকেই পরিস্ফুট করিয়াছে। সরসঙ্ঘচালক এবং তিনি দুইজনেই দেশের মানুষের বৈচারিক মতভেদ দূর করিবার জন্য সমস্ত সম্প্রদায়, শ্রেণী এবং বিদ্বৎসমাজের মধ্যে ভাবনার আদানপ্রদান করিবার কথা বলিয়াছেন। বিবিধতাকে মানিয়া লইয়াই সমরস সমাজ নির্মাণের কথা বলিয়াছেন। বহু ভাষা, বহু উপভাষা থাকা সত্ত্বেও ভারত এক রাষ্ট্র বলিয়াছেন। অসহিষ্ণুতার কথা না বলিয়া সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে দেশ গঠন করিতে হইবে এবং ভারতীয় পরম্পরার মূল কথা 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বলিয়াছেন। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও বাজারি সংবাদমাধ্যম ভাবিয়াছিল পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে দুইজনেই মুখর হইবেন। তাহা না হওয়ায় দুই পক্ষই বড়ই হতাশ হইয়া ভোল বদল করিয়াছে। সঙ্ঘের দুর্নাম করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে কেহ অনুষ্ঠান মঞ্চের ছবিও বিকৃত করিয়াছেন।

কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের চরিত্র অবাক করিবার মতো। মণিশঙ্কর আইয়ারের দেশবিরোধী বক্তব্য, পাকিস্তানে যাইয়া ভারতের নিন্দা করা, কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ত নেতাদের সঙ্গে দেখা করা ইত্যাদিতে তাহাদের কোনও বিরোধিতা দেখা যায় নাই। কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা চিরকাল প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের এভাবেই অবজ্ঞা করিয়া নিজেদের পাপ আড়াল করিয়া চলিয়াছে। সঙ্ঘ কিন্তু সবাইকেই সঙ্গে লইয়া চলিতেছে। নাগপুরের অনুষ্ঠান তাহারই প্রমাণ।

সুভাষিতম্

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।

পূজনীয়ো যথান্যায়ং সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।। (চাণক্যনীতি)

নীচ ব্যক্তিও যদি উচ্চবর্ণের গৃহে উপস্থিত হয়, তাহলে তাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করা উচিত। যেহেতু অতিথি সকলের কাছেই গুরুর মতো পূজনীয়।

প্রণববাবুর নাগপুর সফর দেশজ কমিউনিস্টদের উলঙ্গ করে সামনে এনেছে

নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষে সঙ্ঘশিক্ষা বর্গের সমাপ্তি সমারোহে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিকে পছন্দ করছেন না সোনিয়া গান্ধী এবং তাঁর পুত্র রাহুল। কারণ, তাঁরা মনে করেন আর এস এস অচ্ছুত সাম্প্রদায়িক সংগঠন। তাঁদের রাজনীতিতে আর এস এস মহাত্মা গান্ধীর হত্যায় জড়িত সংগঠন। বাস্তবে যা শুধু অসত্যই নয়, মানহানিকর। অবাক লাগে যখন শুনি প্রণববাবু প্রবীণ কংগ্রেসি নেতা হয়ে কীভাবে সঙ্ঘের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। দেশের কংগ্রেসি গাধাদের বোঝানো যাবে না যে ২০১২ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে প্রণববাবুর সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। তিনি আর প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা নন। সোনিয়া-রাহুলকে খুশি করার দায় তাঁর নেই। আর এস এস অচ্ছুত নয় এবং বেআইনি নয়। দেশের সর্ববৃহৎ সমাজসেবী সংগঠন। কংগ্রেসে থাকতে গেলে আর এস এস বিরোধিতা করতে হবে। এই শিক্ষাটা তাদের দিয়েছে সিপিএম। কংগ্রেসের নিজস্ব ভাবনা চিন্তা মতবাদ বলতে কিছু নেই। নেহরু ছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার অনুগত চিন্তা ভাবনার শরিক। ইন্দিরার কানে মন্ত্র দিতেন ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতি বসুরা। এখন সোনিয়া-রাহুলকে রাজনীতি শেখান সীতারাম ইয়েচুরি প্রকাশ কারাতরা। ভিটে মাটি হারানো কমিউনিস্টদের কাছে তাদের শিখতে হচ্ছে দেশভক্তি। কংগ্রেস নেতারা বামেদের কাছে রাজনীতির পাঠ নিতে চান তো নিন। কিন্তু দেশবাসী বামেদের রাজনীতি অনেক আগেই খারিজ করে দিয়েছেন। কেউই এখন বামেদের হুঁকোয় তামুক সেবা করতে চাইছে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রণববাবুকে নাগপুরের আমন্ত্রণ জানানো হলো কেন? সোজা সরল উত্তর, তিনি শুধুই সুপণ্ডিত নন, হিন্দু ধর্ম বা হিন্দুত্ব নিয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। সংসদের রেকর্ডে ধর্ম নিয়ে কীর্ণাহারের উপবীতধারী এই ব্রাহ্মণ সন্তানের যত মতামত আছে তা দ্বিতীয় অন্য কোনও সাংসদের নেই। প্রণববাবুকে

গুরুপুরুষের কলম

আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর সেই পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেওয়ার পর তাঁর অতীত জীবনের কার্যকলাপ নিয়ে কাটাছেঁড়া করাটা অবান্তর। তাঁর ৮২ বছর বয়সে তিনি যদি তাঁর চিন্তা-ভাবনা দেশবাসীকে জানাতে চান তবে আপত্তি উঠছে কেন? নাগপুরে আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জন্মভিটা দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন প্রণববাবু। এটি তাঁর কর্মসূচিতে ছিল না। সেখানে ভিজিটার্স বুকে তিনি ইংরেজিতে লেখেন, ''ভারতমাতার এক মহান সন্তানকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে আজ এখানে এসেছি।'' পরে ডাঃ হেডগেওয়ারের মূর্তিতে প্রণববাবু মাল্যদান করেন। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ দেশপ্রেম নিয়ে আমার ভাবনা জানাতেই নাগপুরে এসেছি। ভারতে জাতীয়তাবাদ ভাষা-ধর্ম-জাতিতে বিভক্ত নয়। সাংবিধানিক দেশপ্রেমই জাতীয়তাবাদ। এক ধর্ম, এক ভাষা ভারতের ভিত্তি নয়। বহুত্ববাদ ও সহিষ্ণুতা ভারতের আত্মা।'

প্রণববাবু জানান, সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতজীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিনি আনন্দিত। বলেন, শুধু হিন্দু নয়, সমস্ত সমাজকে সংগঠিত করতে চায় সঙ্ঘ। হিন্দু, মুসলমান, দলিত কেউ ব্রাত্য নয় সঙ্ঘের কাছে। সোনিয়া-রাহুলের নাম উল্লেখ না করেও সমালোচকদের এক হাত নেন প্রণববাবু। তিনি বলেন, ''আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতাও দেশের মুক্তি সংগ্রামে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই আন্দোলনে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তিনিও জেলে গেছেন। সঙ্ঘ চায় দেশের সমগ্র সমাজকে নিয়ে চলতে। মতভেদ থাকবে নিজের জায়গায়। মত বিনিময় চলবে।'' প্রণববাবু বলেন, ''১৮০০ বছর ধরে ভারত ছিল গোটা বিশ্বের শিক্ষাকেন্দ্র। এই সময় চাণক্য লিখেছিলেন অর্থশাস্ত্র। ভারতে সভ্যতা পাঁচ হাজার বছর ধরে চলছে। সহাবস্থানই ভারতের বৈশিষ্ট্য। সঙ্ঘও এই কথা বলে।'' সমস্যায় পড়েছে মার্কসবাদী মার্কামারা নেতারা। তাঁদের মতলব ছিল প্রণববাবুর নাগপুর যাত্রা নিয়ে কংগ্রেসকে বিভ্রান্ত করে রাজনীতিতে জলঘোলা করার। সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ। উল্টে প্রমাণ হয়ে গেল যে বামেরা ভিন্ন মতকে শ্রদ্ধা বা সম্মান করে না। অবশ্য সকলেরই জানা যে ভিন্ন মতের প্রতি কমিউনিস্টরা কোনওদিনই সহিষ্ণু নয়। এক পয়সার কমিউনিস্টরা বিরুদ্ধ মত শুনলে চোয়াল শক্ত করে হাত মুঠো করে আকাশে তোলেন। ভাবখানা এমন যে বিরোধী মতের মানুষজনকে কিলিয়ে স্ববশে আনবেন। একটু লক্ষ্য করে দেখবেন যে, বাঙালি মার্কসবাদীরা রাজ্যপাট হারিয়ে দেশের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়ার পরেও অহংকার নামক ব্যাধিটা তাদের হাড়ে মজ্জায় রয়ে গেছে। প্রণববাবুর নাগপুর সফর দেশজ কমিউনিস্টদের উলঙ্গ করে সামনে এনেছে। কমিউনিস্টরা বহুত্ববাদ, পরমত সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করে না।

■

দিদি হবেন জাতীয়, ভাইরা বিজাতীয়

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

দিদির এখন দারুণ লাগছে। আর যা যা দারুণ লাগছে তাতেই তিনি বলেছেন—দারুণ অগ্নিবাণে রে...

মানে বুঝলেন না তো! না, কেউই বুঝছে না। এটা গরমের এফেক্ট কিনা জানি না। আসলে মাথাটা ঠিক রাখতে পারছেন না।

মমতা দিদি এখন বড় দিদির মতো দেশের সমস্ত আঞ্চলিক দলগুলিকে এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করছেন কংগ্রেসকে দূরে সরিয়ে রেখে। তার আগে খাতায় কলমে নিজের রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটে শক্তি প্রদর্শন করে নিলেন বটে, কিন্তু, ফাঁক ফোকরগুলো বন্ধ না করলে বালির ধ্বস নামবে তৃণমূলের সাম্রাজ্যে। গায়ের জোরে কতদিন চলবে? বিপদ বাড়বে।

গ্রাম ও সমিতির ভোটের ফল যাই হোক না কেন, রাজ্য রাজনীতির গোটা ছবি আসলে ধরা পড়ে জেলা পরিষদের রেজাল্টে। সেখানে দিদির দল তো ম্যারাথন রেসের ফার্স্ট বয়ের মতো ছুটেছে। সেকেন্ড বয়কে দেখা যাচ্ছে না সিনে।

জেলা পরিষদের রেজাল্টই তো বলে দেয় সামনের লোকসভা নির্বাচনে কে কোন পজিশনে রয়েছে। অনেকটা ওয়ার্ম আপের মতো। কারণ, গ্রামসভায় বা সমিতিতে হারা জেতা অনেকটাই ঠিক হয় মুখ চেনা বা আত্মীয়কুটুমের ভোটের উপরে ভরসা করে। কিন্তু জেলা পরিষদের প্রার্থীকে ভোটাররা সাধারণত দলের প্রতীক দেখেই ভোট দেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৭৫ শতাংশ আসন তৃণমূল জিতে নিলেও, তাদের আসল স্বস্তি জেলা পরিষদের রেজাল্টে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও, দিদির ঘুম ছুটে যাওয়ার মতো অনেক রসদ কিন্তু রয়েছে এই নির্বাচনের ফলাফলে।

● পায়ের তলায় মাটি না চোরাবালি?

ভোটারদের সমর্থনের দাঁড়িপাল্লায় ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে তৃণমূল, তা কিন্তু নেত্রী ঠিক করে জানতেই পারলেন না। তার বড় কারণ, জেলা পরিষদেরই ২৫ শতাংশ আসনে তো ভোটই হয়নি। সেখানে একতরফা প্রার্থী দিয়ে জিতে গিয়েছে তৃণমূল। বীরভূমের মতো জেলায় তো ভোটের আগেই ভোট জিতে গেছে শাসকদল। সুতরাং, পায়ের তলায় গায়ের জোর ছাড়া মাটি কতটা শক্ত তা বুঝতেই পারলেন না নেত্রী।

● জোর যার মুলুক তার :

এই গায়ের জোরে মানুষকে ভোট দিতে না দেওয়ার মাশুল কিন্তু একদিন না একদিন তৃণমূলকে দিতেই হবে। আজ নয়তো কাল। বামেদেরও দিতে হয়েছিল। 'আজকের ছবি' তো অনেক জায়গাতেই দেখা গেছে। যেখানে প্রতিরোধ হয়েছে সেখানেই মুখ থুবড়ে পড়েছে শাসকদল। তা সে প্রতিরোধ বিরোধীদের থেকে আসুক বা সাধারণ গ্রামবাসীদের থেকে। ভাঙড়ের কেসই তো বলে দিচ্ছে আরাবুলের সাম্রাজ্যেও ৫ জন নির্দল জিতে গেলেন জমি রক্ষার নাম করে।

● বহিরাগতদের সাহস কত!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের মুখেই বলেছেন সীমান্তের পাশের জেলাগুলিতে বিরোধীরা ঝাড়খণ্ড বা অসম বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকিয়ে ভোট করিয়েছে। তার মানে সেখানে শাসক দলের সংগঠন এতটাই খারাপ যে, বাইরের লোক আসতে পারে ভোট করাতে। প্রশাসনও কিছু করতে পারে না। এই সব এলাকায় সংগঠন কিন্তু চিন্তায় রাখবে তৃণমূলকে।

● জঙ্গলমহলের চোখ লাল, থুড়ি গেরুয়া :

সংগঠন যে চিন্তার বিষয় তা দেখিয়ে দিয়েছে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া বা বাঁকুড়া। মূলত জঙ্গলমহলের বনবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। সেখানকার গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলই বলে দিচ্ছে স্থানীয় নেতাদের উপরে খাপ্পা গ্রামবাসীরা। তা সে দুর্নীতির জন্যই হোক বা দাদাগিরির জন্য বা উন্নয়নের ঘাটতির জন্যই হোক। এই ফাঁক মাও-বিজেপি-সিপিএম-ঝাড়খণ্ডি তত্ত্ব দিয়ে ঢাকা যাবে না।

● দলেই যত দুষ্টু লোক :

দলের মধ্যে যে লাগামছাড়া গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়েছে, তা কাউকে বলে দিতে হবে না। নির্দল প্রার্থী ও একই আসনে তৃণমূলের একাধিক মনোনয়ন জমার সংখ্যা দেখে সহজেই বোঝা যায় খেয়োখেয়ি কোন মাত্রায় পৌঁছেছে। তা সামাল না দিলে লোকসভা বা বিধানসভায় দলের বুথ সাললাবে কে?

● এক বনাম একের গেরুয়া মেঘ :

তৃণমূলের সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হওয়া উচিত কিন্তু গেরুয়া বাহিনী। যে বিজেপি ২০১৩ সালের গ্রাম পঞ্চায়েতে ১.২০ শতাংশ আসনে জিতেছিল, এবার ২০১৮ সালে তারা ১২ শতাংশ আসনে জিতেছে। বাম বা কংগ্রেস ধুলোয় মিশে গেছে প্রায়। তাই লোকসভার খেলা যদি একের বদলে এক হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু ২০১৯-এ তৃণমূলের কপালে দুঃখ রয়েছে। বিরোধী ভোট ভাগ না হলে যে কোনও শাসকের কপালেই দুঃখ থাকে।

—**সুন্দর মৌলিক**

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কোথায় কী বলবেন তা কি আমরা ঠিক করব?

অতিথি কলম

ধনঞ্জয় মহাপাত্র

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদর দপ্তরে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করায় সংবাদমাধ্যমে মহা হৈ-হট্টোগোল শুরু হয়ে গেছে, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বেশ কিছু তথাকথিত মুক্ত চিন্তক ও স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষী এনিয়ে সবিশেষ ক্ষুব্ধ।

আর এস এসের দপ্তরে পদক্ষেপ করা থেকে তাঁকে নিরত করতে এক ধরনের পরিকল্পিত তৎপরতা দেখা গিয়েছে। এঁরা খুব জোরের সঙ্গে শ্রী মুখার্জীকে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে না যেতে নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে এঁরা প্রণববাবুকে একেবারে টিপিক্যাল কংগ্রেসিদের মতো আচরণ করার উপদেশ দিয়েছে।

২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে কেন্দ্রে কংগ্রেস পরিচালিত জোট সরকার যখন একটার পর একটা সমস্যার জালে প্রতিনিয়ত জড়িয়ে পড়ত, তখন চটজলদি মোক্ষম বাস্তববুদ্ধি ও রাজনৈতিক কুশলতার মাধ্যমে এই প্রণববাবুই পরিত্রাতার ভূমিকায় নামতেন। আজকে যাঁরা সব সীমা লঙ্ঘন করে প্রণববাবুর আর এস এসের সদর কার্যালয়ে ভাষণ দেওয়া উচিত কিনা বা দিলেও কী তাঁর বলা কর্তব্য ইত্যাদি উপদেশ দেওয়ার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন, তাঁরা কিন্তু পক্ষান্তরে দেশের অন্যতম একজন সেরা রাজনৈতিক মস্তিষ্ক, যিনি বিদ্যায় প্রজ্ঞায় একেবারেই প্রথম শ্রেণীর, তাঁর বৈদগ্ধ্যকেই খাটো করে দেখছেন। আর এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁর একদিনে জন্মায়নি। দীর্ঘদিনের কংগ্রেসি রাজনীতির বিস্তারিত পরিপ্রেক্ষিতের উত্থান-পতনের সক্রিয় সহযোগী হিসেবে এটা তাঁর অর্জন।

আবার বলছি, এই স্বনিয়োজিত টুইটার ও ফেসবুকে খুশি থাকা উপদেষ্টামণ্ডলী সঠিকভাবেই এবং প্রায়শই ভারতীয় সংস্কৃতির বহুমুখী বৈচিত্র্যের ওপর জোর দিয়ে থাকেন। এই বৈচিত্র্যের অনুষঙ্গই হলো নানা মতের প্রকাশ অর্থাৎ বাক্‌স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা। তাঁরা কিন্তু এখন বাস্তবে বৈচিত্র্য বা নানা মত ছেড়ে দিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে একেবারেই প্রতি কংগ্রেসি সুলভ আর এস এসের প্রতি তীব্র ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ দেখতে উৎসাহী।

বলা দরকার, উপর্যুপরি প্রণববাবুকে আর এস এসের সংশ্রবে না যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চেষ্ট করার মাধ্যমে এই স্বঘোষিত নির্দেশকরা কিন্তু অত্যন্ত গর্হিতভাবে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করেছেন। প্রথমত, ব্যক্তির জীবনের গোপনীয়তা ও জীবনের অধিকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে তার নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ যার ওপর নাক গলানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ওই বাক্‌স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে।

এই উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে আবার এমন একটা বিশেষ প্রজাতির বুদ্ধিজীবীদের উপগোষ্ঠী আছেন যাঁরা ভাবেন যে এ জগতে তাঁরা যেটা ঠিক মনে করেন সেটাই একমাত্র সঠিক কাজ। এঁরা চান তাদের মতামতটাই সকলে দেখুক, সঙ্গে সঙ্গে লাইক করুক ও বিপুলভাবে ট্যুইট রিট্যুইটের মাধ্যমে এটিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় চারিয়ে দিক। এই আত্মরতিপ্রিয় (narcissist অর্থাৎ নিজের প্রতি এক ধরনের বিকৃত ভালোবাসা) ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় কেউ যদি বিরোধিতা করে অর্থাৎ অর্থাৎ আসল সত্যটা খুঁজতে চায়, তাহলেই এঁরা রাগে ফেটে পড়েন। আর কালবিলম্ব না করে তাঁরা বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের তথাকথিত সহিষ্ণুতার ভঙ্গুর সীমা তড়িতে তছনছ করে নখদন্ত নিয়ে আক্রমণ করেন।

সরাসরি তাঁরা সমালোচকদের বিরুদ্ধে দেশের সামাজিক সংহতি সুস্থিতি নষ্ট করে দেওয়ার মতো অভিযোগ নিয়ে আসেন। আবার ভাগ্যক্রমে সমালোচক যদি জনপ্রিয় নাম হন সেক্ষেত্রে তো এই ধর্মনিরপেক্ষী ও বহুত্ববাদীরা কোমর বেঁধে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করেন।

তাঁদের মতে মত প্রকাশের অধিকার একটি একমুখী রাস্তা। এই সূত্রে প্রণববাবুর আর এস এসের সদর দপ্তরের সমাবেশে ভাষণ দেওয়াটা কি একান্তই প্রণববাবুর ব্যক্তিগত পছন্দের নয়? কোনও ব্যক্তি সংগঠন তো নয়ই, সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকা কোনও ব্যক্তিও তাঁর এই পছন্দের অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। হ্যাঁ, সেখানে তিনি কী বক্তব্য রাখলেন তার সারাৎসার বিষয়বস্তু নিয়ে বিশ্লেষণ ও পরবর্তী নিন্দা বা প্রশংসা যা কিছু হতেই পারে।

এই স্বঘোষিত উপদেষ্টারা অন্তত মুখ খোলার আগে প্রণববাবুর সভার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে তিনি কী বললেন না বললেন তার জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু আমরা তো এও জানি যে উপদেষ্টাদেরও বক্তব্যের ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সব সময়ই রয়েছে যার মাধ্যমে এই বিশ্বচরাচরের যা কিছুকেই তারা সমালোচনার গণ্ডির মধ্যে নিতে পারে।

দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বাস্থ্য রক্ষায় সদা সংবেদনশীল

এই শিক্ষিত ও নানা বিষয়ে সজাগ পণ্ডিতদের অনুরোধ করব ২৪.৮.১৭ তারিখের পুটুস্বামী বনাম সরকার (আধার গোপনীয়তা) মামলায় ৯ বিচারকের বেঞ্চের দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের রায়টিতে নজর দিতে। এই রায়ে বিচারকরা নাগরিকের ব্যক্তিগত পছন্দের অধিকারকে অপরিহার্য বলে রায় দিয়েছেন। মহামান্য আদালত বলেছে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব গোপনীয়তার অধিকার বলে সে নিজের মনোমত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যার ফলে তাঁর মানবিক ব্যক্তিত্বও প্রকাশিত হতে পারে। এই অধিকার বলে যে কোনও ব্যক্তি তার নিজস্ব বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা, মত প্রকাশ, কোনও মৌলিক চিন্তা, আদর্শবাদ, ভালোমন্দ নির্ধারণের সঙ্গে সমাজে চালু থাকা কোনও একই ধরনের মতের অনুসারী হওয়ার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নিজ ইচ্ছে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বহুমুখীনতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই ব্যক্তি গোপনীয়তা শর্তটিকে মান্যতা দেওয়া হয়, যাতে ব্যক্তি তার অধিকার প্রয়োগ করে সমাজের চলতি ধারা থেকে আলাদা হয়ে তার নিজের জন্য একটি নিঃসঙ্গতার অঞ্চল তৈরি করতে পারে যেখানে সে একান্তই আলাদা, বিচ্ছিন্ন।

জোট রাজনীতির একবারে কেন্দ্রস্থলে থেকে একজন অতিকুশলী ক্ষুরধার রাজনীতিজ্ঞ হয়ে ইনিংস শেষ করার পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক হন। এই সময়পর্বে অবসর উপভোগের ফাঁকে তিনি হয়তো যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিলেন নিবিষ্ট মনে তাঁর অতীত রাজনৈতিক জীবনে নেওয়া পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তগুলির নিবিষ্ট পর্যালোচনার। অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে জীবনের নিঃসঙ্গতার অনুভব অনেক সময় একটি সচল মনকে অসুস্থ করে তুলতে পারে, আবার তা তাকে প্রজ্ঞাবানও করে তুলতে পারে। কিন্তু প্রণববাবুর মতো একজন অত্যন্ত নিবিড় পুস্তকপ্রেমীর পক্ষে ইত্যবসরে তাঁর সদা তৎপর রাজনৈতিক মনটিকে হয়তো কিছুটা দার্শনিকতার প্রান্তসীমায় নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হতে পারে।

> মতে মত প্রকাশের অধিকার একটি একমুখী রাস্তা। এই সূত্রে প্রণববাবুর আর এস এসের সদর দপ্তরের সমাবেশে ভাষণ দেওয়াটা কি একান্তই প্রণববাবুর ব্যক্তিগত পছন্দের নয়? কোনও ব্যক্তি সংগঠন তো নয়ই, সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকা কোনও ব্যক্তিও তাঁর এই পছন্দের অধিকার কেড়ে নিতে পারে না।

সুপ্রিম কোর্ট পুটুস্বামী মামলার সময়ও কিছুটা দার্শনিকতার গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলে জানায়, ''গোপনীয়তাই মানুষের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বটিকে তুলে ধরে আর এর ফলেই একজন মানুষের তার একান্ত ব্যক্তিগত পছন্দের অধিকার সুরক্ষিত হয়। যে তার গভীর গোপন ভাবনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারে।'' এত সবের পরেও মানতে হবে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সে কাজ করে সমাজের চৌহদ্দির মধ্যেই। তাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বও বিকশিত হয় তার সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী। প্রতিটি মানুষ আর একজন মানুষের সঙ্গে মেলামেশায়, কথপোকথনে তার ব্যবহারিক জীবনের রূপটি প্রকাশ করে। সে যে সম্পর্ক তৈরি করে অনেক সময় তার প্রভাব পড়ে বাকি সমাজের উপরেও। ঠিক একই ভাবে একজন ব্যক্তির জীবন তৈরির ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিরাট ভূমিকা থাকে যেহেতু সে সমাজের অংশ হিসেবেই বাঁচে।

যাই হোক, বিচক্ষণ বিচারপতিরা তাঁদের পর্যবেক্ষণে যে বিশ্লেষণটি রেখেছিলেন সেটির দিকে নজর দিলে এই পণ্ডিতরা আর একটু জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেন। ''ব্যক্তিগত পছন্দই মানুষের জীবনযাত্রার পথ নির্ধারক, তাই এটি ব্যক্তিগত গোপনীয়তারই অঙ্গ। ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার বৈচিত্র্যময় সমাজে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সমাজে এই গোপনীয়তার অধিকারই ভিন্নতাকে টিকিয়ে রাখে। বহুমাত্রিকতাকে ও আমাদের সংস্কৃতির বৈচিত্রকে সংরক্ষণ করে।'

আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি খোলা মনে তাঁর নিজ পছন্দের প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর বাকস্বাধীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দপ্তরে কী বললেন তার বিশ্লেষণ করার অঢেল সময় পাওয়া যাবে। ■

রম্যরচনা

এক শিক্ষক ভুলবশত অন্য এক লোকের নাম্বারে রিচার্জ করে ফেলেছেন। যখন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তখন সেই লোকটাকে অনেকবার ফোন করলেন, কিন্তু লোকটা ফোন ধরেনি।

তখন শিক্ষক মহাশয় লোকটাকে মেসেজ দিলেন— লস্কর-ই- তৈবায় আপনাকে স্বাগত। আপনি আমাদের রিচার্জ স্বীকার করে তালিবানের সদস্য হয়ে গেছেন! সতর্ক থাকবেন, সরকারি এজেন্টরা আপনার উপর কড়া নজর রাখছে, আপনার ফোন খুব সাবধানে ব্যবহার করবেন। ঘাবড়ে গিয়ে লোকটা শিক্ষককে ফোন করে জানালো যে সে লস্কর-ই-তৈবার সদস্য হতে চায় না।

শিক্ষক বললেন— রিচার্জ ফিরিয়ে দিন সদস্যপদ অটোমেটিক বাতিল হয়ে যাবে! আধা ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষকের মোবাইলে রিচার্জ হয়ে গেল।

* * *

বিধানসভায় হাবু চট্টোপাধ্যায় তার বক্তৃতার ফাঁকে একটি গল্প বলেছিলেন : ''বাবা তার তিন ছেলেকে ১০০ টাকা করে দিয়ে বললেন যে এমন কিছু কিনে আনো যাতে ঘরটা পুরো ভর্তি হয়ে যায়। বড়ো ছেলে ১০০ টাকার খড় কিনে আনল কিন্তু তা দিয়ে ঘর পুরোপুরি ভর্তি করতে পারল না। মেজো ছেলে ১০০ টাকার তুলো কিনে আনল কিন্তু তাতেও ঘর পুরো ভর্তি হলো না। ছোটো ছেলে ৫ টাকা দিয়ে একটি মোমবাতি কিনে আনল এবং ঘরের মাঝখানে রেখে জ্বালাল। এতে পুরো ঘর আলোতে ভরে উঠলো।'' হাবু চট্টোপাধ্যায় আরও বলতে লাগলেন যে ''আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন ছোটো ছেলেটির মতো। যেদিন থেকে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন এই রাজ্য উন্নতির আলোতে ভরে উঠেছে।'' পিছন থেকে আওয়াজ এল ''সেটাতো ঠিকই আছে, কিন্তু বাকি ৯৫ টাকা গেল কোথায়?''

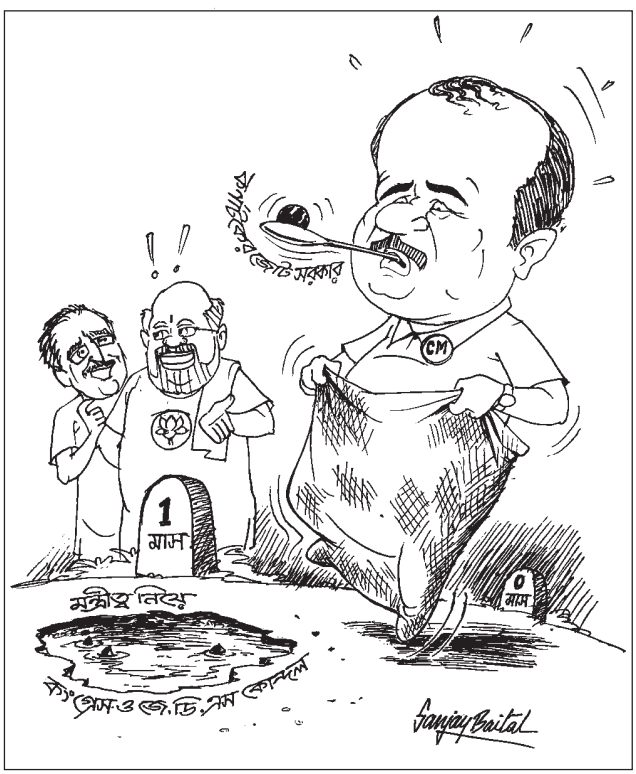

উবাচ

"দেশে ইসলাম নিয়ে রাজনীতি ও সন্ত্রাসবাদের কোনও স্থান নেই। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িত থাকার জন্য দেশের ৭টি মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

গার্নট ব্লুমেল
অস্ট্রিয়ার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী

অস্ট্রিয়ায় মসজিদের জঙ্গি যোগ প্রসঙ্গে

"পুলিশ-প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল যে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছে, তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছেন রাজ্যবাসী।"

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্যসভাপতি

তৃণমূলের সন্ত্রাস নিয়ে বলরামপুরের সভায়

"পড়শি ও এসসিও দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের উন্নতি চায় ভারতও। কিন্তু আর্থিক জোগানে স্বচ্ছতা ও দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে নয়।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

সাংহাইয়ে এসসিও-তে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগ প্রসঙ্গে

"ছাড়ার আগে বাংলো তছনছ করেছেন তিনি। এটা তাঁর হতাশার বহিঃপ্রকাশ।"

রাকেশ ত্রিপাঠী
ইউ পি বিজেপির মুখপাত্র

সপা প্রধান অখিলেশের বাংলো ছাড়ার আগে ভাঙচুর প্রসঙ্গে

"নীরব মোদীকে দেশে ফেরানোর ব্যাপারে ব্রিটিশ মন্ত্রীপরিষদের সদস্য ব্যারোনস উইলিয়ামসের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। আর্থিক প্রতারণা করে যারা দেশ ছেড়েছে এবার তাদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।"

কিরণ রিজিজু
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী

প্রতারণায় অভিযুক্ত দেশত্যাগীদের ফিরিয়ে আনা প্রসঙ্গে

২০১৯-এ কেন নরেন্দ্র মোদীকে আবার ভোট দেবেন?

ড. সুদীপ ঘোষ

দেখতে দেখতে বর্তমান এনডিএ সরকার চার বছর পার করলো। নরেন্দ্র মোদীর এই সরকারকে এবং তাদের কাজকর্মকে চার বছর পর্যবেক্ষণ করেছি এবং তার আগের ইউপিএ সরকারের ১০ বছরের শাসনকালের সঙ্গে মিলিয়ে একটা তুলনামূলক আলোচনা এই সূত্রে করা যেতেই পারে— কেন নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে আবার ৫ বছরের জন্য দিল্লির মসনদে বসাতে পারি?

প্রথমেই বলি, মানুষের প্রাথমিক চাহিদা খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য— এই দিকগুলিতে মোদী সরকার কী করেছে। ২ টাকা কেজি চাল ও গম সারাদেশে গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ৮ কোটি বিপিএল পরিবারকে বিনামূল্যে এলপিজি বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা, যাতে এই দরিদ্র পরিবারগুলো কাঠের জ্বালানির ক্ষতিকারক ধোঁয়া থেকে বাঁচতে পারে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে দেশের প্রত্যেক গৃহহীন পরিবারকে মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করে দেওয়া। সর্বশিক্ষা অভিযান, একলব্য বিদ্যালয় স্থাপন, নবোদয় স্কুল, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এবং মিড-ডে-মিলের মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার করা। উচ্চশিক্ষায় গবেষকদের ভাতা বাড়ানো এবং বিভিন্ন গবেষণাগারের ফান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ দেওয়া ও ব্রেন ড্রেন বন্ধ করা। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যুগান্তকারী 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প ঘোষণা করে ১০ কোটি পরিবারকে সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকার বিমার আওতায় নিয়ে আসা।

> ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ যারা এখনো বিজেপিকে ব্রাত্য করে রেখেছে তাদেরও ভাবার সময় এসেছে। এই বিজেপি সরকারই তিন তালাক বিলের মাধ্যমে মুসলমান মহিলাদের নিরাপত্তা দিয়েছে। হজ-এর সাবসিডি বন্ধ করে সেই টাকায় মুসলমান মহিলাদের মানোন্নয়ন করছে। যারা অসহিষ্ণুতার অভিযোগ তুলে চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন তাদের জেনে রাখা ভালো IPSOS MORI সমীক্ষা অনুযায়ী ভারত বিশ্বের চতুর্থ সহনশীল রাষ্ট্র।

এবার দেখা যাক, অন্য ক্ষেত্রগুলি যেমন রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, শৌচালয় নির্মাণ ইত্যাদি দিকগুলি। গত ইউপিএ জমানায় যেখানে ২৮৭০০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে (১০ বছরে) সেখানে মোদী সরকার মাত্র ৪ বছর ২৮৫০০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করে ফেলেছে। ৩১টি এয়ারপোর্টের কাজ শুরু হয়েছে। ২০১৪ পর্যন্ত ৬টি মেট্রো প্রকল্প ছিল। গত ৪ বছরে সারাদেশে ৩১টি মেট্রো প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ১৫টি নতুন প্রস্তাবিত ৪৪০০ কিলোমিটার রেল প্রকল্পের কাজ সময়ে শুরু হয়েছে। এছাড়াও ন্যাশনাল হাইওয়ে এক্সটেনশান, গ্রামীণ সড়ক যোজনার মাধ্যমে সারা দেশকে জুড়ে দেওয়ার কাজ চলছে।

বিগত ইউপিএ সরকার ২০০৫ সালে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ২০০৯ সালের মধ্যে ভারতের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবে। তারা ব্যর্থ হয়েছে। সেই অসাধ্য সাধন করেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। প্রায় ৬ লক্ষ বিদ্যুৎহীন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। এছাড়াও ভবিষ্যতের বিদ্যুতের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ৫৩৮৮০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক চুল্লি সময় মতো কাজ শুরু করেছে যা ২০১৪ সালে মাত্র ৪৭৮০ মেগাওয়াট ছিল। স্বচ্ছ ভারত মিশনে ৫৮ লক্ষ শৌচালয় নির্মাণ হয়েছে। ২০১৪ সালে যেখানে মাত্র ৩৯ শতাংশ শৌচালয় নির্মাণ হয়েছিল, বর্তমানে তা ৮৩ শতাংশে পৌঁছেছে। রাস্তা নির্মাণ ২০১৪ সালে যেটা ছিল ৬৯ কিলোমিটার প্রতিদিন, ২০১৮-তে তা দাঁড়িয়েছে ১৩০ কিলোমিটার প্রতিদিন।

এবার আসি বিশ্বমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের আলোচনায়। কংগ্রেস ৬০ বছরে যেখানে ৩টি এ আই আই এম এস ও ১৫টি আই আই টি তৈরি করেছিল, এন ডি এ সরকার সেখানে দু দফায় ১০ বছরে ১৮টি এ আই আই এম এস ও ৮টি আই আই টি

বানিয়েছে। জনধন যোজনার মাধ্যমে প্রায় ২১ কোটি দরিদ্র ভারতবাসীকে জিরো ব্যালান্স অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার যার বর্তমান রাশিমূল্য প্রায় ৩৩৫০০ কোটি টাকা। এই অ্যাকাউন্টগুলোর মাধ্যমে এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ভরতুকির টাকা সরাসরি পাঠানো গিয়েছে যার মাধ্যমে আর্থিক দুর্নীতি অনেকটাই কমানো গিয়েছে। প্রায় ৮৩ হাজার কোটি টাকা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার করা গেছে। ২০১৪ পর্যন্ত যেখানে ৫৩ শতাংশ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করা গিয়েছিল বর্তমানে তা প্রায় ৮০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমার সঙ্গে ২.৯৫ কোটি ব্যক্তি যুক্ত। অটল পেনসন যোজনার মাধ্যমে ২১.৬ লক্ষ ব্যক্তি যুক্ত। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় আছে ৮১ লক্ষ কন্যা। মুদ্রা লোনের মাধ্যমে ১৭ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হয়েছে যার অর্থমূল্য ৫০০০ কোটি টাকা। কৃষকদের জন্য কৃষি বিমা এবং সর্বোপরি তাদের আয় ২০২২-এর মধ্যে যাতে দ্বিগুণ হয় সে ব্যবস্থা করা। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের মাধ্যমে কন্যা সন্তানদের নিরাপত্তা দেওয়া— এসবই হয়েছে মোদী জমানায়।

এবার আসি ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতির সমৃদ্ধির আলোচনায়। ২০১৪ পর্যন্ত যেখানে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ছিল ৩৬ বিলিয়ন ডলার, ২০১৮-তে দাঁড়িয়েছে ৬০ বিলিয়ন ডলারে। স্টিল উৎপাদনে জাপানকে টপকে ভারত দ্বিতীয়, মোবাইল উৎপাদনে দ্বিতীয়, অটোমোবাইল শিল্পে চতুর্থ এবং শক্তি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। কংগ্রেস জমানায় যেখানে ইউরিয়ার উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা বর্তমানে আবার ২০ লক্ষ টনে পৌঁছে গেছে। ফ্রান্সকে টপকে বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতির মর্যাদা পেয়েছে ভারত। জিডিপি ৭.৩ শতাংশ ছুঁয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি ২০১৮-র মার্চ-এ ২.৪৭ শতাংশে নেমেছে। সেনসেক্স ৩৫০০০ ছুঁয়েছে। এপ্রিল ২০১৮-তে জিএসটি আদায় ১ লক্ষ কোটি ছাড়িয়েছে। ইনকাম ট্যাক্স কালেকশান ১০,৫০,০০০ কোটি। ২৬ শতাংশ আয়কর সংগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশাল সংখ্যক আয়কর রিটার্ন দাখিল হয়েছে। ২.৫ লক্ষ ভুয়ো কোম্পানি বন্ধ হয়েছে। বহু বেনামি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। জাল নোট অনেকাংশে বন্ধ করা গেছে। ইউরেশিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান ইয়ান ব্রেমার বলেছেন বিনিয়োগের কথা ভাবলে চীন ও আমেরিকার আগে ভারতের কথা ভাবতে হবে। নোটবন্দি ও জিএসটি নিয়ে যারা বিরোধিতা করছিলেন তাদের মুখ নিশ্চয় এবার বন্ধ হবে।

ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ যারা এখনো বিজেপিকে ব্রাত্য করে রেখেছে তাদেরও ভাবার সময় এসেছে। এই বিজেপি সরকারই তিন তালাক বিলের মাধ্যমে মুসলমান মহিলাদের নিরাপত্তা দিয়েছে। হজ-এর সাবসিডি বন্ধ করে সেই টাকায় মুসলমান মহিলাদের মানোন্নয়ন করছে। যারা অসহিষ্ণুতার অভিযোগ তুলে চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন তাদের জেনে রাখা ভালো IPSOS MORI সমীক্ষা অনুযায়ী ভারত বিশ্বের চতুর্থ সহনশীল রাষ্ট্র।

এবার একটু ইউপিএ-র ১০ বছরের জমানায় বড় দুর্নীতিগুলোর দিকে নজর দেওয়া যাক। কয়লা দুর্নীতি ১,৮০,০০০ কোটি টাকা। কমনওয়েলথ দুর্নীতি ৭৫,০০০ কোটি টাকা। ২-জি স্পেকট্রাম দুর্নীতি ১,৭৬,০০০ কোটি টাকা। ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতি ৫,০০০ কোটি টাকা। নরেন্দ্র মোদীর ৪ বছরের জমানায় এখনো অবধি কোনও বড় দুর্নীতি হয়নি। যারা নীরব মোদী, ললিত মোদী, বিজয় মাল্য, মেহুল চোকসির নামগুলো বলছেন— মনে রাখবেন এদের প্রত্যেকের ঋণগুলি খেলাপি হয়েছিল ২০১৪-র আগে। মোদী জমানায় তাদের দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর সরকার দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না, আর তাই তারা অর্ডিন্যান্স এনে বড় ঋণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। মোদীর চেষ্টাতেই স্যুইস ব্যাঙ্ক ২০১৯ থেকে তাদের সমস্ত তথ্য (ভারতীয়দের) ভারত সরকারের হাতে তুলে দেবে।

যারা ব্যাঙ্কে প্রবীণদের গচ্ছিত অর্থের উপর সুদ কমানোর সমালোচনা করছেন তারা ইউপিএ জমানায় মুদ্রাস্ফীতি ও বর্তমান সরকারের জমনায় মুদ্রাস্ফীতি তুলনা করলে উত্তরটা পেয়ে যাবেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো মোদী সরকার প্রবীণদের মাসে ১০,০০০ টাকা করে পেনশন দেবার চিন্তাভাবনা করছেন। তবে এসবিআই-তে মিনিমাম ব্যালান্স না থাকার জন্য সঞ্চিত অর্থ কেটে নেওয়ার তীব্র নিন্দা করছি কারণ এই মিনিমাম ব্যালান্স যাদের থাকে না তারা সবাই দরিদ্র ভারতবাসী— এটা মাথায় রাখতে হবে। সম্প্রতি মোদীজী বলেছেন 'গণতন্ত্রে সমালোচনা প্রয়োজন'--- তাই আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আরও মজবুত এনডিএ সরকার গঠন করতে হবে।

সবশেষে কয়েকটি কথা না বললেই নয়। গোটা বিশ্বে যেভাবে জিডিপি-র ইঁদুর দৌড় শুরু হয়েছে তাতে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। আমরা পূর্বপুরুষদের থেকে যে পরিবেশ পেয়েছি সেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে হবে। সঞ্চিত জীবাশ্ম জ্বালানিও শেষ হয়ে আসছে। বর্তমানের মোদী সরকার পেট্রোল ডিজেলের পরিবর্তে Bioethanol ব্যবহারে উৎসাহিত করছে— এতে জ্বালানির সমস্যা যেমন মিটবে, তেমন পরিবেশও বাঁচবে। অন্যান্য পরিবেশবান্ধব শক্তির কথাও ভাবতে হবে। আর এই ভরতুকির রাজনীতি, পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির ট্রাডিশন ভেঙে মোদী সরকারকে বেরিয়ে আসতে হবে। ভরতুকি দিয়ে, সাহায্য করে একটা জাতিকে অক্ষম করে দেওয়া হয়। ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে গেলে দেশের মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হবে। ভারতকে শক্তিশালী দেশ হিসাবে দেখতে গেলে দেশের বিপুল মানবসম্পদকে কাজে লাগাতে হবে।

দেশের প্রত্যেক নাগরিকের মাথার উপর যে ঋণের বোঝা সেটা কমাতে গেলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, দেশের মানুষকে সক্ষম করতে হবে--- এই ব্যাপারগুলো মাথায় রেখে আগামী দিনে পথ চলতে হবে। ■

বিরোধীদের কোনও নরেন্দ্র মোদী নেই

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সম্প্রতি কৈরানা এবং ফুলপুর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের পর একটি হাওয়া তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিরোধীরা। তারা বলতে চাইছে, এই উপনির্বাচনগুলিই প্রমাণ করছে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনেই বিজেপির বিদায় ঘণ্টা বাজবে এবং দিল্লিতে ক্ষমতায় আসবে বিরোধীদের জোট সরকার। এরই পাশাপাশি এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম কংগ্রেস সভাপতির ভিতর অতি সফল একজন রাজনীতিককেই খুঁজে বের করতে ব্যস্ত। কৈরানা এবং ফুলপুরে বিজেপির বিরুদ্ধে জোট বেঁধে লড়েছিল বিরোধীরা। তাতে জয় আসায় উৎফুল্ল বিরোধীরা বলছে, ২০১৯-এ মোদীকে হারাতে এই জোটের ফর্মুলাতেই এগোতে হবে। এখানে একটু বলে নেওয়া দরকার, সাম্প্রতিক এই উপনির্বাচন শুধু কৈরালা এবং ফুলপুরেই হয়নি। লোকসভা এবং বিধানসভা আসন মিলিয়ে মোট ১৫টি কেন্দ্রে এই উপনির্বাচন হয়েছিল। এই ১৫টি কেন্দ্রের ভিতর ১০টি আগে থেকেই বিরোধীদের দখলে ছিল। কাজেই নতুন করে এখানে বিরোধীদের জয়ে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল ৫টি আসনে। সেখানে বিরোধীরা জিতেছে ৩টিতে। বিজেপি ২টিতে। কাজেই, এই ফলাফল এমন ইঙ্গিত করছে না যে, ২০১৯-এ বিরোধী জোটের ক্ষমতায় আসা নিশ্চিত। বরং, এটুকু বলতে পারা যায় যে, ২০১৯-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা যথেষ্ট উত্তেজক হবে।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কে জিতবে, কে হারবে— সে পরের কথা। তার আগে বড় প্রশ্ন— ২০১৯-এ বিজেপিকে মোকাবিলা করার জন্য যে বিরোধী জোটের কথা বলা হচ্ছে— তার চেহারা কী হবে? ভারতের রাজনীতিতে এই মুহূর্তে দাঁড়িপাল্লার একদিকে বিজেপি, অন্যদিকে

কংগ্রেস-সহ সমস্ত বিজেপি বিরোধীরা। বিজেপির রাজনৈতিক সাফল্য এইটিই যে, বিজেপি প্রমাণ করে দিয়েছে, রাজনৈতিক শক্তিতে একক ভাবে তাকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা এই মুহূর্তে কোনও বিরোধী দলের নেই। কংগ্রেসের তো নেই-ই। বিজেপির ভরসাও এটাই যে, এই বিরোধীরা যদি এক না হতে পারে, সেক্ষেত্রে বিজেপির জয়ের রাস্তা পরিষ্কার। লাখ টাকার প্রশ্ন এটাই যে, আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বিরোধীরা কি এক হতে পারবে? এর আগে দিল্লিতে জোট রাজনীতি কখনই খুব একটা সাফল্যের মুখ দেখেনি। কংগ্রেস এবং বিজেপিকে বাদ রেখে এর আগে যে জোট সরকারগুলি দিল্লিতে ক্ষমতায় বসেছে, সেগুলি তাদের পূর্ণ মেয়াদ কখনই পূরণ করতে পারেনি। তার একটি বড় কারণ, শরিক নেতাদের ভিতর মতানৈক্য এবং ক্ষমতার দখলদারি নিয়ে কামড়া-কামড়ি। অন্য একটি কারণ, কংগ্রেসের মতো দলের বাইরে থেকে উস্কানি দিয়ে এই জোট সরকারগুলি ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টা। কাজেই, এই জোট সরকার সম্বন্ধে দেশের মানুষের অভিজ্ঞতা এবং ধারণা কোনওটাই খুব ভালো নয়।

এবারও নির্বাচনের আগে বিজেপির বিরুদ্ধে জোট গঠনের কথা উঠেছে। সম্প্রতি কর্ণাটকে এইচ ডি কুমারস্বামীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাবৎ বিরোধীরা তাঁদের ১১ জন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর উপস্থিতিতে জোটের জল্পনা আরও উসকে দিয়েছেন। যদিও, কর্ণাটকে জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত দুটি দল নির্বাচনের পরে হাত মিলিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে সরকার গঠন করে, কর্ণাটকের জনগণের গণতান্ত্রিক রায়কে অবমাননা করেছে। ফলে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে অন্তত কর্ণাটকে এই বিরোধীরা জোট গড়ে কতটা সফল হবেন— সে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। আর লোকসভা নির্বাচনের আগেই যদি কুমারস্বামী- কংগ্রেসের রাজনৈতিক মধুচন্দ্রিমা শেষ হয়ে যায়— তাহলে অবশ্য জোটের বেলুন আপনা থেকেই ফুটো হয়ে যাবে। লোকসভা ভোটের আগে বিরোধীরা যে জোটের কথা বলছেন, তাতে একটি বিষয় লক্ষণীয়। এই বিরোধীরা কিন্তু এখনও পর্যন্ত সর্বসম্মতভাবে একটি বিরোধী জোট গড়ে তোলার কথা বলতে পারছে না। পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু এবং তেলেঙ্গানার চন্দ্রশেখর রাও কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অন্য আর সবাইকে নিয়ে ফেডারেল ফ্রন্ট গড়ে তোলার কথা বলছেন। প্রাথমিকভাবে এই ফেডারেল ফ্রন্টের চিন্তাটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ফেডারেল ফ্রন্টের ভাবনার পিছনে অবশ্য মমতার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাও কাজ করছে। মমতা জানেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কোনও ফ্রন্ট হলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তুলে ধরা হবে। কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভা

নির্বাচনে রাহুলকে এই জায়গাটি ছেড়ে দিতে রাজি নন মমতা। এই জায়গাটিতে নিজেকে তুলে ধরতে তাঁর এই ফেডারেল ফ্রন্টের অবতারণা। চন্দ্রবাবু নাইডু এবং চন্দ্রশেখর রাওয়ের সমস্যাটি অবশ্য অন্যরকম। চন্দ্রবাবু এবং চন্দ্রশেখর তাঁদের দুজনকেই স্ব স্ব রাজ্যে মূল লড়াইটা লড়তে হয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এখন নিজেদের রাজ্যে যদি তারা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার কথা বলেন, তাহলে কংগ্রেস-বিরোধী ভোটারদের একটা বড় অংশই তাদের বিপক্ষে চলে যায়। ফলে তারাও কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ফেডারেল ফ্রন্ট গঠনের পক্ষেই মত দিয়েছেন।

কংগ্রেসেকে নিয়ে ফ্রন্ট গড়ার কথা বলেছেন সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, রাষ্ট্রীয় জনতা দলের তেজস্বী যাদব এবং বহুজন সমাজ পার্টির মায়াবতী। কংগ্রেসকে নিয়ে ফ্রন্ট গড়লেও, রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করতে তারা রাজি আছেন তো? ইতিমধ্যেই মায়াবতী জানিয়ে দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী পদে তিনিই যোগ্যতম দাবিদার। মায়াবতীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তাঁর দল প্রচারও শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল গান্ধী এখনও পর্যন্ত কোনও নির্বাচনে সাফল্য দেখাতে পারেননি। এমনকী কর্ণাটক বিধানসভার নির্বাচনেও কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে নেমে এসেছে। কাজেই কংগ্রেসকে নিয়ে জোট গড়ার কথা বললেও, প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে মেনে নিতে অনেক আঞ্চলিক দলের নেতাদেরই আপত্তি থাকবে।

এরপর হচ্ছে, আসন সমঝোতার বিষয়টি। বিজেপির বিরুদ্ধে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়াটা বিরোধীদের পক্ষে প্রায় অসম্ভবই। ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রস্তাব দিয়েছেন, নিজ নিজ রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলি নিজেদের মতো করে লড়ুক। ফলাফল বেরনোর পর সরকার গড়ার প্রশ্নে আলোচনা হবে। এইরকম একটি অবাস্তব তত্ত্বে নির্ভর করে বিজেপিকে হারানো বিরোধীদের পক্ষে অলীক কুসুম কল্পনা। মমতা, চন্দ্রবাবু নাইডু বা চন্দ্রশেখর রাও— কেউই নিজেদের রাজ্যে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণেই কংগ্রেসের সঙ্গে আপস করতে পারবেন না। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের সঙ্গে আপস করাও মমতার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে, যাঁরা কংগ্রেসকে নিয়ে জোট করার কথা বলছেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে তারা কতটা সহমত হবে— তা নিয়ে সন্দেহ আছেই। মনে রাখতে হবে, দু-একটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের সঙ্গে লোকসভার উপনির্বাচনের মূলগত পার্থক্য রয়েছে। উপনির্বাচনগুলিতে সরকার গড়ার প্রশ্ন সামনে আসে না। ফলে সেখানে আসন সমঝোতা করা অনেক সহজ। কিন্তু যখনই সরকার গড়ার প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়াবে— তখনই কেউ নিজের ভাগের আসনটি অন্যকে ছাড়তে চাইবেন না। ইতিমধ্যেই মায়াবতী সে ইঙ্গিত দিয়েই রেখেছেন। ফলে, কৈরানা এবং নুরপুর জেতার পর ভাতিজা যত উল্লসিত হয়ে রয়েছেন— অতটা উল্লাস লোকসভা নির্বাচনের আসন সমঝোতার সময় তাঁর নাও থাকতে পারে।

বাকি রইল কংগ্রেস। কংগ্রেসের শক্তি অনেকখানি ক্ষয় হয়ে গেলেও, এখন মানতে হবে যে, বিজেপির বিরুদ্ধে একক বৃহত্তম দল এখনও কংগ্রেসই। রাজস্থান, হরিয়ানা, ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের মতো রাজ্যগুলিতে এখনও বিজেপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসই। কাদায় পড়া হাতির মতো কংগ্রেস এখন যদিও মায়াবতী-অখিলেশদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে— তবু এ মনে করার কারণ নেই যে, আসন সমঝোতার প্রশ্নে সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ করতে কংগ্রেস রাজি থাকবে। কংগ্রেস যে মায়াবতী-অখিলেশের কাপড় কাচা, বাসন মাজার কাজ করতে শুধু রাজি হবে— এমন ধারণা করার কোনও কারণই নেই। কাজেই যে উত্তরপ্রদেশের উপনির্বাচনের ফলাফল দেখে এখন নাচছেন বিরোধীরা, তারাই হয়তো দেখবেন, জোটের পথে সব থেকে বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে উত্তরপ্রদেশে।

আর একটি যে প্রশ্নে বিরোধীরা বিব্রত হবেন, তা হলো, প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন? কুমারস্বামীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যে এগারোজন বিরোধী নেতানেত্রী উপস্থিত ছিলেন--- তাঁরা সকলেই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুপ্ত বাসনা এঁদের কারোরই কিছু কম নয়। ইতিমধ্যেই রাহুল গান্ধী বলে ফেলেছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য তৈরি আছেন। মমতা এবং মায়াবতী রাহুলকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী মানতে নারাজ। মমতার দল তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে প্রচার করছে। প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদারদের দৌড়ে চন্দ্রবাবু নাইডু এবং এইচ ডি দেবেগৌড়াও রয়েছেন। কাছেই বিরোধীদের পক্ষে বলা সম্ভবই নয়---কে তাদের সর্বসম্মত প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী।

আবার ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে মোকাবিলা করতে বিরোধীদের যদি দুটি ফ্রন্ট হয়, তাহলে অবশ্যই দুটি ফ্রন্টের দুজন নেতা হবেন। এই দুজনের মধ্যে কাকে বিরোধীরা সর্বসম্মত নেতা বলে মেনে নেবেন? যাকে মেনে নেওয়া হবে না— তিনি মুখ বুজে জোটে থাকবেন তো? জোটকে কেন্দ্র করে এরকম অনেক অপ্রিয় প্রশ্ন সামনে আসতে বাধ্য।

বিজেপির সুবিধা এটাই যে বিরোধীদের কোনও নরেন্দ্র মোদী নেই— যিনি হাজার প্রতিকূলতার ভিতরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন দলকে। সম্প্রতি টাইমস গোষ্ঠীর একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, এখনও ৭১ শতাংশ ভোটদাতা মনে করছো নরেন্দ্র মোদীই আবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য। এই সরকারের কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে মানুষের মনে ক্ষোভ থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মনে করছেন— এই সরকারের বিকল্প আপাতত নেই। আর প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার? সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প হিসাবে যেসব মুখ তুলে আনা হচ্ছে, যেমন--- রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়— দৌড়ে তাঁরা নরেন্দ্র মোদীর থেকে কয়েক যোজন পিছিয়ে।

সমীক্ষায় একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে--- জোট গড়তেই পারেন বিরোধীরা— কিন্তু মোদীকে সরানোর ক্ষমতা তাদের নেই। ■

২০১৯-এর নির্বাচন, আতঙ্কের সংক্রমণ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সদ্য ৪টি লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের ১০টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশে কৈরানা ও নুরপুরে এখনও পরীক্ষাগারে থাকা একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা সাফল্যের মুখ দেখেছে। দেশময় মোদীর বাপান্তকারীরা হুল্লোড়ে মগ্ন। কৈরানার প্রার্থী আগের বারের চেয়ে ৪ শতাংশ ভোট কম পেয়েছেন (প্রদত্ত ভোটের হার প্রায় ৫ শতাংশ কম ছিল), বিধানসভা নুরপুরে বিজেপি ৩৯ শতাংশ থেকে ৪৭ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি করলেও হেরে গেছে। জেতা আসন হারানো অবশ্যই বড় পরাজয়। এবারে বিভিন্ন দলীয় দপ্তরে ফলাফল পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কিছু আঁচ (কল্পিত) নেওয়া যেতে পারে। ওহো, ইতিমধ্যে কর্ণাটকে শপথ গ্রহণে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়ার একটা বেসরকারি মহড়াও দেখা গেছে।

(১) বহেনজীর দপ্তর— আরে এই ডান হাতটা বড্ড ঝনঝন করছে। কেন বহেনজী? আরে ওই রাহুল জো দলিত কলাবতীর ঘরে ফটো খিঁচানে গয়া থা না ওর মা জোরে হাত ধরেছিল। ভীষণ ব্যথা করছে। তাহলে আপনি আগে বলেছিলেন দলিতের সংস্পর্শে এলে ডেটলে চান করতে হবে, তো ইনি কী করবেন? সুইমিং পুলে কড়া দাওয়াই ঢেলে চান তো নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু এরাও তো খুব কষ্টের মধ্যে আছে। নিকম্মা লেড়কা একটা স্টেটও জিততে পারছে না তবু দাদা পরদাদার সম্পত্তি প্রধানমন্ত্রীর আসনেই বসতে হবে। ওদিকে কী standard herald-এর টাকা ঘাপলানোর মামলা চলছে। সিটও কোথা থেকে কোথায় নেমে এসেছে। আমারও তো তাজ করিডর আর ডিসপ্রপরসনেট সম্পত্তির মামলা চালু রয়েছে। এ মোদী কো মু হি কালা। লেকিন এক বাত, গতবার শুধু মুসলিমই দাঁড় করিয়েছিলুম সব ভাঁড় মে চালা গিয়া। এটা মনে রেখো নম্বরই আসল। ৪০ কা কম আসনমে সমঝোতা কভি নেহি।

(২) সমাজবাদী দপ্তরে উল্লাস বেশি। ভীষ্ম পিতামহ নেতাজি বসে আছেন। চারদিকে পরিবারেই আরও ৪ সাংসদ (মোট পাঁচ)। রাজ্য সভার রামগোপাল হাজির। নেতাজি জানতে চাইলেন আমাদের কেনডিডেট কেন গেল না ও আরএলডি কা তো কবর হো গিয়া থা। কিন্তু ও আদমী অজিত বহুৎ ডেঞ্জারাস ও সব সরকারমে মন্ত্রী থে। ওর কোনও বাছবিচার নেই স্রেফ কামাই হি কামাই।

এতো পুরা সাচ পিতাজী— বলল অখিলেশ। কিন্তু জোটের বাজারে ওর কাছে পশ্চিম প্রদেশের সোলিড কিছু জাঠ ভোট ছিল তাই। মায়া কী বলছে? কে যেন বলে উঠল ''নেতাজি ১৯৯৫ সালে রাজ্য অতিথিশালায় আমাদের গুণ্ডারাই তো ওনাকে ইয়ে— বলাৎকারের চেষ্টা করেছিল। বিজেপি-র ব্রহ্মদত্ত তেওয়ারী ওনাকে বাঁচান ও পরে খুন হয়ে যান।'' আরে বেওয়াকুফ মারো গোলি বালাৎকারকো। এখন পুরো দলেরই বলাৎকার চলছে! না সংসদ না বিধানসভায়। কত আসন কমে গেছে! হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখো ইয়ে বিজেপি বালো সুপ্রিম কোর্ট মে পিআইএল লাগাকে মুখ্যমন্ত্রীর বাংলো ছোড়নে কা নোটিস ভি দে দিয়া। আমি ২ বছর সময় চেয়েছি কিন্তু মোদী এসে গেলে তুরন্ত ভাগিয়ে দেবে। কি দিনকাল পড়ল! আজম কা ৫০ মহিষ খুঁজতে একশো পুলিশ ছুটল। আভি আজমকা, সব গরকানুনি কসাইখানা বন্ধ। এ বেটা দেখ, কোনও সমঝোতা কমসে কম রাজনীতির দোকান বাঁচাতে তো কর। মোদীকা সত্যনাশ হো।

(৩) পরের দৃশ্য পাটনায় বাবড়ীর বাড়ি। ছেলেপুলেদের নিয়ে বিজেপির পিণ্ডি চটকাচ্ছিলেন একাই, কেননা লালু জেল খাটতে গেছেন। তেজস্বী জোকিহাট বিধানসভায় পূর্বতন ডাকাত ও লালুর মন্ত্রী তসলিমুদ্দিনের (মৃত) ছেলে জে ডি (ইউ)-কে হারানোয় গরম হয়ে ফিরেছে।

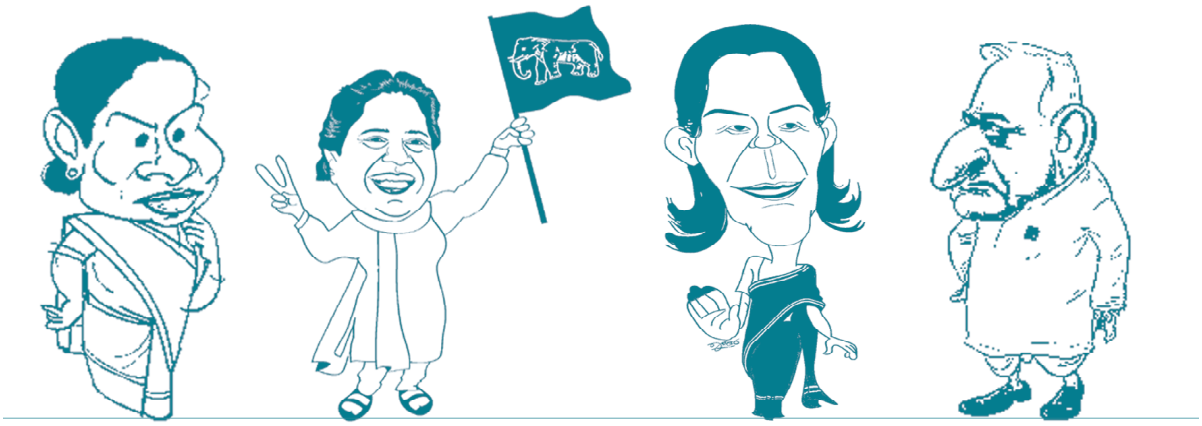

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ১৯৬৯ সালে কেন্দ্র হওয়ার পর এই বিশিষ্ট ডাকাত পরিবারের এখান থেকে ১৪ বার জেতার ঐতিহ্য রয়েছে। বড় ছেলের পর এবার ছোট ছেলে। সুবৃহৎ আরজেডি পরিবারের সংযোজিত অংশই বলা যায়। নাম সব আকবরের আমলের। মহম্মদ শাহনওয়াজ আলম। ইনি বলেছেন এবার তাঁর পরিবারের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। এই গোটা এলাকাই মুসলমান প্রাধান্যের প্রায় ৩৫ শতাংশ। খবর এসেছে ইউপিএ-তেও দু' জায়গাতেই মুসলমানরা জিতেছে। সংসদে উত্তর প্রদেশ মুসলমান শূন্য ছিল। এই চার বছর পরে এক বিবিজান তাবাসুম হাসান পৌঁছলেন। ইনি ঝানু মহিলা আগে বিএসপি, এসপি সব ঘাটে জল খেয়ে নিয়েছেন। এনারও একই লক্ষ্য বদ মোদীকে হঠান। এনার কেন্দ্র ও নুরপুরে (বিজেপি ৫৪০০ ভোটে হেরেছে। মুসলমান ভোট দাতা ৪০ শতাংশ)। এরা কিন্তু সব জনহিতকর প্রকল্পের ফল ভোগ করেছে। সাম্প্রতিক আখের দামের বকেয়ার কথা আলাদা। বাকি সমস্ত প্রকল্পের সুফল ভোগ করার কোনও প্রতিদান কোনওদিনই এরা দেবে না। তাহলে যেখানে এরা ৩৫ বা ৪০ শতাংশ সেখানে মেরুকরণ ছাড়া বিকল্প কোনও রাস্তা আছে কি? আরও বিপজ্জনক কথা বলেছেন তেজস্বী যাদব 'লালুবাদের' জয় হলো। লালুবাদ মানে তো জেল যাত্রা।

(৪) যাই হোক, কংগ্রেস দপ্তর দু' ভাগে বিভক্ত। সামনে রাহুলকে ঘিরে আছেন মূলত উকিল নেতারা কেননা সব সময়ই নির্বাচনে যেহেতু তিনি হেরে যান এঁরা কখনও ইভিএম, কখনও টাকা ছড়ানো, কখনও অলীক নানা অভিযোগ নিয়ে আদালতে জিতে আসতে চান। যাই হোক, সংগঠনে পদহীন নেত্রীর ভয়ঙ্কর ন্যাওটা মুসলমান নেতা আহমেদ প্যাটেল ও গোলাম নবি সামনে পর্দা পড়া দ্বিতীয় ভাগে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ কূট আলোচনায় মগ্ন থাকার পর তাঁরা বাইরে এলেন। উৎকণ্ঠায় ভরপুর এলি-তেলি নেতারা জানতে চাইলেন কী আদেশ! ওঁরা বললেন, নেত্রী জানতে চাইছেন কতগুলো পায়ে ধরা হয়েছে। হতবাক সকলে বললেন মানে অন্য দলের? হ্যাঁ, ৩৬ হাজার ভোটে সিদ্ধিরামাইয়াকে জেডি (এস) হারানোর পর কুমারস্বামীর পায়ে ধরে যে যাত্রার শুরু তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশই এসেছে। কেজরিওয়ালের পায়ে ধরতে কে যাবে? কে বলল, উনি তো শীলা দীক্ষিতের বিরুদ্ধে বোধ হয় এফআইআর করবেন বলেছিলেন। তা ছাড়া আমাদের ঘুষখোর, বেইমান ছাড়া কথা বলতেন না। ''এখন আর বলবে না। দেখলে না ও নিজে কতবড় নির্লজ্জ, বেহায়া বিজেপির নেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসছে। ওর সবটাই ঝুটা আমাদের সঙ্গে একবারে খাপে খাপ।''

''মায়াবতী, মুলায়মের পা কদাচ ছাড়বে না। ইউপিএ থেকে আমি আর ব্যাটা ছাড়া কেউ সংসদে নেই। কেউ কিছু দেবে কিনা বলা মুশকিল, তবে ভিক্ষের চাল কাড়া আর না কাড়া।'' কিন্তু ওরা বেশি সিট পেলে খোকাকে ছাড়বে? ভেতর থেকে খ্যানখ্যানে কিন্তু নৃশংসতায় ভরা আওয়াজ এল ''চোপ। সেসব পরে দেখা যাবে। দেখনি দেবেগৌড়া আর গুজরাল ভেড়ুয়াদের কি করেছিলুম। ও আমরা জানি। আমার দেওর সঞ্জয় এই অজিতের বাপকেও ভিখিরি করে দিয়েছিল। এসব আমাদের রক্তে। ও নিয়ে ভেবো না। ওটাকেও ধোরো। এখন নম্বর বাড়াও আর খোকার কথা মনে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়।'' কিন্তু চন্দ্রবাবু তো ওদিন মুখ খোলেননি, হয়তো ওর শ্বশুরকে চূড়ান্ত অপমান করার কথা মনে রেখেছে, তাই না ম্যাডাম? এ প্রান্ত থেকে কে যেন মিউ মিউ করল। বললুম না এখন শুধু খোকার কথা কায়মনবাক্যে ভাববে, মান অপমান তুচ্ছ। সে তো দাগি আসামি লালুকেও একসময় That Monkey বলে দেখাই করতে চাইনি। এখন তো পা জড়িয়ে কিছু না পাওয়ার জায়গায় ২৭টা লোক বসিয়েছি। মোদী আমাদের পথে বসিয়ে দিয়েছে। একে তাড়াতেই হবে। National Herald-এর যে কবে দিন পড়ে আবার?

(৪) দিল্লি ছাড়ার আগে আপ-এর দপ্তরে ঢুঁ মেরে জিজ্ঞেস করতে বলল, কেজরি নেই। কোথায় না কোথায় ক্ষমা চাইতে গেছে, ফেরার ঠিক নেই। বাকিরা পরস্পর অন্য লোককে অবিরাম গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে।

(৬) একবারে কলকাতায়। ৪০ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত মহেশতলায় নির্বাচন ছিল। দল ৬২ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছে। নীচে নেতা সমর্থকদের মেলা ভিড়। এক মুসলমান মন্ত্রী দেদার মস্তি ভরা মুখে ঢুকলেন। পাশের ঘর থেকে মিষ্টি আওয়াজ আসছিল- মুসলমান স্বর্গ, মুসলমান ধর্ম, মুসলমান হি পরমন্তপঃ। প্রশ্ন উড়ে এল, হ্যাঁরে উত্তরপ্রদেশ, বিহারে মুসলমানই জিতেছে? হ্যাঁ গো ঠিকই। বার বার বলছি মুসলমানকে মালা কর। ৯৮ সাল থেকে বিজেপির ঘরও করেছি কিন্তু মধুর নাগাল পাইনি। যেই এদের মুয়াজ্জিন, আজানদার সব ভাতা, মেয়েদের নানারকম উপহার, ঢালাও মাদ্রাসার ব্যবস্থা করলুম দেখ কেল্লা ফতে। সঙ্গে ছিল কত সব লালদাড়ি গোঁড়া মৌলবী ওরাই 'ম্যাকানাস গোল্ডের' মতো খনির রাস্তা চিনিয়ে দিল। সরকারি ভাবে ৩৬ আসলে প্রায় ৪০ শতাংশ নিট ভোট। কে পাল্লা দেবে? এটা বাড়াতে হবে। কে যেন বলল, একটা সংখ্যালঘু 'জন্মসাথী' ভাতা চালু করে দিলে হয় না? জন্মালেই ৫ হাজার টাকা। একজন অতি পৃথুল ব্যক্তি কোণের দিকে আলোচনা স্থলের কাছাকাছি ছিলেন। হয়তো বা সতর্ক করলেন— ''দেখ সংখ্যাটা আর বাড়ালে কী হবে বলা যায় না, ১৪ শতাংশের তফাত তো! অবিভক্ত বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে ফজলে হক, সৈয়দ সুরাবর্দী ওরফে কসাই বসেছিল মনে রেখো।'' এখনও 'দার উল হারব' আছে অর্থাৎ কাফেরদের কিছু ক্ষমতা আছে।' 'দার উল ইসলাম' এলে ওঃ কি ভয়ঙ্কর! তবু দিল্লি যেতে এরাই পুঁজি, এদের ছাড়া যাবে না। ওখানে পৌঁছতে পারলে অন্য খেলা। মোদী নিপাত যাক! □

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের

মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

পঞ্চায়েত নির্বাচনে কুড়ি হাজার প্রার্থীর আগেই জয়লাভ নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকে গেল

নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

আমাদের সংবিধান ৩২৬ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট দেওয়ার ও ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার দান করেছে। বিশেষ আইনগত কারণ ছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক কোনও নর-নারীকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। ড. এস. সি. কাশ্যপের মতে, এটা স্বাধীন ভারতের মহোত্তম বিপ্লব ('the greatest revolution'— আওয়ার কন্সটিটিউশান,পৃ. ২৫৫)।

আরও বলা দরকার, এই অধিকার যাতে সর্বাঙ্গীণভাবে কার্যকর করা যায়, তার জন্যে সংবিধান একটা পৃথক অধ্যায় (পঞ্চদশ) যুক্ত করেছে। বলা হয়েছে, লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনের ব্যাপারে তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য একটা পৃথক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংস্থা (Election Commission) থাকবে— (শব্দগুলো হলো, 'supervision, direction and control')।

গণপরিষদে হৃদয়নাথ কুঞ্জ বলেছিলেন— যদি নির্বাচন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের হাতে থাকে, তাহলে গণতন্ত্রের শিকড়টাই বিষাক্ত হয়ে যাবে— ('poisoned at the root')। সেক্ষেত্রে শাসকদলই সৃষ্টি করবে একটা স্বৈরতন্ত্র। এই কারণেই তাঁরা পৃথক ও স্বাধীন একটা সংস্থার হাতে এই দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তার হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতাও দিয়েছেন। ড. এম. ভি. পাইলি মন্তব্য করেছেন— এতেই বোঝা যায় এই অধিকারটি সুরক্ষিত করার জন্য সংবিধান রচয়িতারা কত আন্তরিক উদ্বিগ্ন ছিলেন— ('anxious to safeguard this political might– অ্যান্ ইন্ট্রোডাক্শান টু দ্য কন্স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২৭৩)। তাই বিভিন্ন রাজ্যে এই পবিত্র ও প্রাথমিক অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য গঠিত হয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। তার কাজ পঞ্চায়েত, কর্পোরেশন প্রভৃতির নির্বাচন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

এগুলো বাস্তব কারণে খুবই দরকারি ছিল। প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রে ('city state'), নগর কেন্দ্রে (market-place) সাধারণ মানুষই সব সিদ্ধান্ত নিতেন। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কবেই বিদায় নিয়েছে রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি ও জন-বিস্ফোরণের কারণে। এখন মানুষ ভোটের মাধ্যমেই শাসকদের ক্ষমতায় বসান এবং সময় সময় সরকার বদল করেন ভোটেরই মাধ্যমে। কিন্তু এই নির্বাচন যদি সুষ্ঠু, স্বাধীন, প্রভাবমুক্ত ও স্বচ্ছ না হয়, তাহলে গণতন্ত্র বলে কিছু থাকতেই পারে না। সেই জন্য ড. হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন, 'the success of democracy depends upon free and fair election'— (ইন্ডিয়া : ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৩৩৫)। অনুরূপভাবে ড. বি. সি. রাউতও জানিয়েছেন যে, সব নির্বাচনকে হতেই হবে সুষ্ঠু, স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ--- (ডেমোক্র্যাটিক কন্সটিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২০১)।

আমাদের দেশে কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য নির্বাচন শুরু হয়েছে ১৯৫২ সাল থেকে। আঞ্চলিক স্তরের নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়েছে আরও পরে। প্রথম দিকে নির্বাচন প্রক্রিয়াটা অবশ্যই ছিল স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক। কিন্তু ক্রমে তাতে এসেছে কলুষতা, হিংস্রতা ও বৈরিতা। ভোটার তালিকা তৈরিতে কারচুপি, জালভোট, বুথ দখল, ব্যালট লুট, হানাহানি, গুলি-বোমার তাণ্ডব, ভীতি প্রদর্শন, ভোট কর্মীদের ওপর হামলা, প্রার্থী অপহরণ প্রভৃতি জঘন্য ক্রিয়াকলাপে আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ড. এ.সি. কাপুর মন্তব্য করেছেন— বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে এখন এগুলো নির্বাচন ক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। প্রায় সব কিছুই 'organised and armed hoodlums- এর হাতে এখন— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৪২৫)।

কয়েকবছর আগে একটা লোকসভা নির্বাচনে সারা দেশে দুশো ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটেছিল, আহত হয়েছিলেন হাজার খানেক মানুষ। কয়েক বছর আগেও অনেক প্রার্থীর পেছনে থাকত খুনি-ডাকাত- গুণ্ডারা। এখন তাদের অনেকে নিজেরাই প্রার্থী হয়। এই অবস্থা সম্বন্ধে এস. এল. সিক্রি মন্তব্য করেছেন, 'muscle power has also criminalized our elections– (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৪৪)। কিন্তু শেষ বয়সে এসে এবার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হলো। আগে সাধারণ নির্বাচনের দিনই গণ্ডগোল ও সংঘর্ষ ঘটত। এবার পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও সেটা দেখা গেল আর তার শুরু হয়েছে মনোনয়নপত্র পেশের তারিখ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে। এক্ষেত্রে মনে হয় গোপালকৃষ্ণ গোখলের কথাটা মিলে যাবে— 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow'।

নির্বাচনে জয় পরের কথা। বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়েই নানা ধরনের বাধা পেয়েছেন। এটা অবাধে চলেছে পরেও।

এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজ্যপাল নির্বাচন অফিসার ও রাজ্যের দুই সরকারি কর্তাকে ডেকে অবস্থা সামাল দিতে বলেছিলেন, কারণ গণতন্ত্রে এটা চলতে পারে না।

তাতে অবশ্য কোনও কোনও নেতা তাঁর

ওপর ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়েছেন বা এটা নাকি 'অতি সক্রিয়তা'। অবশ্য যদি আমাদের সংবিধানটা তাঁরা দেখে থাকেন, তাহলে জানতেন— এতে গোঁসা করার কিছু নেই। রাজ্যপাল আদৌ ঠুঁটো জগন্নাথ বা কলের পুতুল নন। ১৫৯নং অনুচ্ছেদ অনুসারে তিনি শপথ নেন। তিনি সংবিধান ও আইনকে রক্ষা করবেন ('preserve protect and defend the constitution and the law') এবং রাজ্যে জনগণের কল্যাণের ('well being') দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আইন ও সংবিধানকে রক্ষা করাও তাঁর অন্যতম কর্তব্য। আর সংবিধানই ব্যক্তিকে ভোটদান ও ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার দিয়েছে। সুতরাং তিনি মূক, বধির ও অন্ধ হয়ে থাকতে পারেন না। আর ১৬৩ (১) নং অনুচ্ছেদ তাঁকে দিয়েছে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বা 'discretionary power'। সেটা তিনিই ১৬৩ (২) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ঠিক করতে পারেন। তার ফলে কমিশন কয়েকটা ব্যবস্থা নিয়েছিল—

(১) বিডিও অফিসে কোনও প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারলে এসডিও অফিসে সেটা জমা দিতে পারবেন; (২) ডিএম, ডিজি ইত্যাদি অফিসারকে বলা হয়েছিল, যাতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওই ব্যাপারে বাধা না পান, তার ব্যবস্থা করতে হবে; (৩) রাজ্য কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইবে। (৪) তিন দফায় নির্বাচন হবে।

কয়েকটা বিরোধী দল সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে গিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টও এই ব্যাপারে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন। হাইকোর্টও এই ধরনের নির্দেশ দিয়েছেন।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, কমিশন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য একটা দিন বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে পরের দিন ভোরেই সেটা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এই তুঘলকি ব্যাপার নিয়ে হাইকোর্ট কমিশনকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে।

প্রখ্যাত সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত 'স্বস্তিকা' পত্রিকায় জানিয়েছেন— এই ডিগবাজির কারণটা চাপসৃষ্টি। সেই রাতেই নাকি রাজ্যের তিন বড় নেতা (কোন্ দলের বুঝতেই পারছেন) নির্বাচন অফিসারের বাড়ি গিয়ে 'নরমভাবে' কিছু বলেছেন। পরের দিন সকালে অন্য একজনও তাঁকে আরও নরম ভাষায় কিছু উপদেশ দিয়েছেন (২৩.৪.১৮)। এর পরে উক্ত অফিসারের আর কিছু করার ছিল না। কারণ তিনি রাজ্যস্তরেরই অফিসার। এই ঘটনা ঠিক? তবে হাইকোর্ট নিজেই মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা একদিন বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কমিশনারের আগের বিজ্ঞপ্তি অটুট থাকলে নির্বাচনের দিন ঘোষণাটা অনেক আগেই হতে পারত।

সরকার-পক্ষের কেউ কেউ জানিয়েছেন— গরম বাড়ছে, তার ওপর রমজান মাস আসছে। সুতরাং নির্বাচনটা তাড়াতাড়ি শেষ করতেই হবে। বিরোধীরা 'নাটক' করে সেটা বিঘ্নিত করতে চাইছেন। কিন্তু যদি কমিশনকে তাঁরা চাপ না দিতেন, তবে অনেক আগেই তারিখটা ঘোষণা করা যেত। আর সেই তাড়াহুড়োর জন্য কমিশন জানিয়েছে— নির্বাচন এক দিনেই হবে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কথা অনুক্ত রয়ে গেছে। কিন্তু যেখানে এত বড় রাজ্যে প্রথমে তিন দফায় ভোট গ্রহণের কথা ছিল, সেখানে হঠাৎ একদিনেই সেই কাজ করা যাবে কেমন করে? তাছাড়া এখানে আছে ৫৮ হাজার বুথ— রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা ৪৬ হাজার। তাহলে প্রতি বুথে ও রাস্তা-ঘাটে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাবে কী ভাবে? হাইকোর্ট বিরোধীদের কয়েকটা দাবি খারিজ করলেও বিচারপতিরাও এই সব কথা ভেবেছিলেন।

কমিশন যেভাবে ১৪ এপ্রিলকে নির্যাতনের দিন বলে ঘোষণা করেছিল সেটাও সিঙ্গল-বেঞ্চের পছন্দ হয়নি— সেটা ডিভিশন বেঞ্চের অনুচ্ছেদের সাপেক্ষ বলে মনে করেছে। তাছাড়া কমিশন পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা করেছিল— সেটাও আদালত নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা ভেবেছে। বোঝা যায়, বিরোধীদের অনেক অভিযোগ বা মানলেও নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক করতে চেয়েছিল আদালত।

আসলে, রাজ্যপালের সক্রিয়তার পরেও অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। কোথাও হয়েছে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব (যেমন আমতা), উদয়নারায়ণপুরে অনেকে প্রার্থী হতে পারেননি, বাঁকুড়া-জামালপুরে গণ্ডগোল হয়েছে। নদীয়ায় সংঘর্ষ হয়েছে, বিজেপির একজন আহত হয়েছেন, অনেক জায়গায় বিডিও-এসডিও অফিসের কাছে প্রার্থীকে যেতে দেওয়া হয়নি, ফলতায় পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে, হরিণঘাটা ও কল্যাণীতে প্রার্থীকে লাইন থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, ভোলায় প্রার্থীর শ্বশুরকে গুলি খেতে হয়েছে, উদয়নারায়ণপুরে বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে। 'দ্য স্টেট্সম্যান' লিখেছিল— 'Violence errupted to-day in differnt points of the state'— (১৪.৪.১৮)।

প্রশ্ন আছে অনেক। কমিশনকে সরকারের সঙ্গে এতবার বৈঠক করতে হবে কেন? নির্বাচনের দিন ঘোষণার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের এত গুরুত্ব থাকবে কেন? পুলিশ কর্তাদের কেন এতে এত প্রাধান্য থাকবে? যদি রাজ্য কেন্দ্রীয় বাহিনী না চায়, তাহলে ভিন্ রাজ্য থেকে বাহিনী আনতে চায় কেন? যদি পর্যাপ্ত পুলিশ তার না থাকে, তাহলে একদিনেই ভোট গ্রহণের দাবি কেন? বিরোধীদের এতবার আদালতে কেন যেতে হলো? কেনই বা ই-মেইলে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হলো অনেককে?

কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ নির্বাচন অফিসারের একপেশে ও অস্থির আচরণের তীব্র নিন্দা করেছে। বিচারপতির মতে, এর ফলেই নির্বাচন নিয়ে এত বিলম্ব ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এই রায় উক্ত অফিসারের কাছে ঘুম ভাঙানিয়া ঘণ্টার মতো ব্যাপার। ডিভিশান বেঞ্চ তাই অফিসারের নিন্দা করেছে। প্রশ্ন করেছে— 'wake-up call' সত্ত্বেও তার ঘুম ভাঙেনি কেন? সেই সঙ্গে জানিয়েছিল— ই-মেলের সব আবেদন পত্রকে বিবেচনা করতে হবে, কারণ প্রার্থীরা সেগুলো জমা দিতে গিয়ে বাধা পেয়েছিলেন।

আদালতের রায়ের ওপর কিছু বলার নেই। কিন্তু কমিশনের নিরপেক্ষতা, রাজ্যের ভূমিকা, নির্বাচনের আগেই ২০ হাজার প্রার্থীর জয়লাভ ইত্যাদি নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকে গেল। ■

আর্চবিশপ কুটোর প্রার্থনা

পৃথিবীতে একমাত্র ভারত ও নেপাল সেই দেশ যেখানে মানবজাতির আদি ধর্ম-সংস্কৃতি সভ্যতা ও জীবনধারা আজও অবশিষ্ট আছে। এই আদি ধর্মের কোনও প্রতিষ্ঠাতা নাই। প্রকৃতি, দেবদেবী মূর্তি, প্রাণী, পূর্বপুরুষ ও মহাপুরুষদের পূজা এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। ২০০০ ও ১৪০০ বছর ধরে খ্রিস্টান মিশনারিরা ও মৌলবিরা দেশে দেশে আদি সনাতন ধর্ম (ভারতে নাম হিন্দু, ইউরোপে পেগান ধর্ম) কনভারসনের মাধ্যমে সংহার করেছে। কনভারসন ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে। অন্যের দেশ দখল করে বা না করে যারা যত বেশি মূর্তিপূজকদের খ্রিস্টান বা মুসলমান করতে পেরেছে, ততবেশি খ্রিস্টান ও মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস এবং হিন্দুর তথা পেগানদের বাসভূমি খ্রিস্টান ও মুসলমান বাসভূমি ও দেশে পরিবর্তিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় আদি ধর্ম বিনাশ করে এখন খ্রিস্টান দুনিয়া ও মুসলমান দুনিয়া মিশনারি ও মৌলবিরা সৃষ্টি করে ফেলেছেন। বাকি আছে ভারতবর্ষ। খ্রিস্টান ও মুসলমান দুনিয়ার মানচিত্রটি দেখলে অনুধাবন করা যাবে।

মানচিত্র অনুসারে অতীত ভারতবর্ষের আফগানিস্তান- পাকিস্তান চলে গেছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রণাম, তাঁদের চেষ্টার ফলে সমস্ত ভারত মুসলমান বা খ্রিস্টান দেশ হয়ে যায়নি। ধর্মান্তর প্রক্রিয়া দ্বারাই বিশাল জমিতে কর্তৃত্ব ও ভোগদখল খ্রিস্টান ও মুসলমানদের হস্তগত। যতদিন ইউপিএ সরকার ছিল ততদিন আর্চবিশপ অনিল যোশে কুটোর কোনও অস্থিরতা শোনা যায়নি। তিনি লিখেছেন, 'আমরা সবাই এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছি। ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র রীতিমতো হুমকির মুখে। ...আপনারা সকলে প্রার্থনা করুন, যাতে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের পর নতুন সরকার আসে।' আমরা দেখি সত্যই এক বড় অস্থিরতা। পশ্চিমবঙ্গে বহু মানুষ হতাহত হলো। মানুষের আতঙ্কের শেষ নাই। এ বিষয়ে কুটো নীরব। তাঁর চেষ্টা মোদী সরকারের পতন। কেন? ধর্মের মোড়কে কনভারসন করে হিন্দুধর্ম বিনাশের কাজে কি বিঘ্ন ঘটছে মোদী সরকারের আমলে? কনভারসন করতে 'টপ-ডাউন' তত্ত্ব প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়। কনস্টেনটাইন খ্রিস্টত্ব গ্রহণ করার পর পেগান ইউরোপ ৩০০ বছরে খ্রিস্টান ইউরোপ হয়ে যায়। অখ্রিস্টান দেশের শাসককে খ্রিস্টায়ত করতে পারলে পেগান প্রজাদের খ্রিস্টান করা সহজ হয়। আর্চবিশপ অনিলের পূর্বে টিপু সুলতান মসজিদের ইমামও নরেন্দ্র মোদীর মুখে চুনকালি মাখানোর কথা বলেছিলেন। তাহলে কি মোদীর রাজত্বে ধর্মান্তরকরণের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলো? ধর্মনিরপেক্ষতা ভারত ছাড়া অন্য দেশের সংবিধানে লেখা আছে? তুরস্কে ১ শতাংশ অমুসলমান কেন?

—ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার,
কলকাতা-৫৫।

নির্বাচন না প্রহসন?

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত ভোট হলো। থুড়ি ভোট না বলে ভোটের প্রহসন শেষ হলো। কয়েকটি প্রশ্ন শাসক দলের নিকট আপনারা তো বহু উন্নয়ন করেছেন, গ্রামেগঞ্জে রাস্তাঘাট পয়ঃপ্রণালী, আলোর ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে অর্থাৎ জনসংযোগও বেড়েছে বলে দাবি করছেন, তাহলে বিরোধীপক্ষ মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে গেলে তাদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? তাহলে কি শাসকশ্রেণী বুঝতে পারছে যে মূলে ঘুণপোকা ধরেছে? তাই উন্নয়নের থেকে তাদের গুণ্ডামির পরিসংখ্যান বেশি সেটা বুঝতে পেরেছে। এরা কোটি কোটি টাকার সাইকেল দিচ্ছে, ইমামভাতা দিচ্ছে, বিষমদ খেয়ে মরে গেলে সেই পরিবারকে দু' লক্ষ করে টাকা দিচ্ছে, ক্লাবগুলিকে আরও বেশি করে টাকা দিচ্ছে।

গোদের উপর বিষফোঁড়ার ন্যায় হাজির হলো ভাগাড়ের মাংস। তবে একটা সুখবর আছে, যেটা এখনও রাজ্যসরকার গোপন রেখেছে আর তা হলো হিন্দু মুসলমান দুঃখ পাবে বলে গোরু শুয়োরের মাংসের কথাটা বেমালুম চেপে যাচ্ছে। এবার এই পঞ্চায়েত

ভোট নিয়ে কমিশনার ও শাসকশ্রেণী বার বার যে প্রহসন করলো তাতে বলা যায় অশ্রুতপূর্ব এই নির্বাচন গণতন্ত্রের বলাৎকার ও সংবিধানের ধর্ষণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হলো। গুণ্ডামি, মারদাঙ্গা করে বিরোধীদের মনোনয়ন দাখিল করতে দেওয়া হলো না। যার ফলে বেশ কয়েক স্থানে একটিমাত্র প্রার্থী আছে। এখানেও দু'নম্বরি। বিবাহের পূর্বে সন্তান, পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে ফলাফলের ন্যায়। রাজ্যে বিভিন্ন দিনে ভোট হলে তা শেষ হওয়ার পূর্বে কেন বেশ কয়েকজন প্রার্থীকে জয়ী বলে শংসাপত্র দেওয়া হলো? সমস্ত ভোট শেষ হওয়ার পূর্বে ওই প্রকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। যাদের জয়ী বলে শংসাপত্র দেওয়া হলো এই কারণে কি যে তারা দলবল নিয়ে যেখানে বিরোধীরা নির্বাচনে শামিল সেখানে গিয়ে ছাপ্পা, রিগিং ও মস্তানবাজি করে বিরোধীশূন্য করবে?

— দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী।

শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্র শাসন

'রামসেতু' বিষয়ক নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ১৯.৩.১৮) সন্দীপ চক্রবর্তী বলেছেন, অগ্নিবাণের সাহায্যে সাগর জলশূন্য করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে সমুদ্রের গভীর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সমুদ্র উৎকণ্ঠিত রামচন্দ্রকে বললেন...। এখানে একটু কাহিনি বিচ্যুতি ঘটেছে। রাম সসৈন্যে সমুদ্র পার হওয়ার উপায় জানতে চাইলে বিভীষণ বলেন সমুদ্রের শরণ নিতে। ইক্ষ্বাকু বংশীয় সগরপুত্রগণ সাগর খনন করেছিলেন, সেই সম্পর্কে সাগর অবশ্যই রামকে সাহায্য করবেন। সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ বিভীষণের পরামর্শ সমর্থন করে বলেন, সেতুবন্ধন বিনা এই সাগর পার হয়ে লঙ্কায় যাওয়া সুরাসুরেরও অসাধ্য। অতএব কালবিলম্ব না করে রাম

সাগরের নিকট প্রার্থনা করুন। রাম তখনই সমুদ্রতীরে কুশাসনে উপবিষ্ট হয়ে সমুদ্রের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। ত্রিরাত্র আরাধনা করলেন, কিন্তু সাগর দর্শন দিলেন না। রাম ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন— সমুদ্রের গর্ব হয়েছে, তাই দেখা দিচ্ছেন না। লোকে দণ্ডদাতাকেই সম্মান করে, তোষণনীতিতে কীর্তি যশ জয় কিছুই লাভ হয় না। রাম কঠোর বাক্যে সাগরকে বললেন, আজ আমি পাতাল সমেত মহার্ণব শুষ্ক করে ফেলব, বানররা পদব্রজে পার হবে। এই কথা বলে তিনি ধনুতে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করে জ্যা আকর্ষণ করলেন। তখন জলরাশি ভেদ করে সাগর স্বয়ং মূর্তিমান হয়ে উঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে রামকে বললেন, সৌম্য, পৃথিবী বায়ু আকাশ জল জ্যোতি এই পঞ্চভূত চিরকাল স্বাভাবিক মার্গেই অবস্থান করে। আমি স্বভাবত অবাধ ও অতরণীয়, কামনা লোভ ভয় বা অনুরাগের বশে জলরাশি স্তম্ভিত করতে পারি না। তুমি যে প্রকারে উত্তীর্ণ হবে তা বলেছি শোন। বানরসেনা যখন পার হবে তখন স্থলের ন্যায় স্থির থাকব, হিংস্র জলজন্তুরাও আক্রমণ করবে না (দ্র: রাজশেখর বসুর 'বাল্মীকি-রামায়ণ ঃ সারানুবাদ')। কাজেই অগ্নিবাণের সাহায্যে সাগর জলশূন্য করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল, একথা বলা চলে না। রাম ধনুকে শরযোজনা করতেই সমুদ্রদেবতা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর সম্মুখে হাজির হয়েছিলেন।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

আধুনিক পৃথিবীর প্রথম বিমান নির্মাতা এক ভারতীয়

বর্তমান পৃথিবীর পরিবহণ মাধ্যমগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বিমান বা এরাপ্লেন। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে কম সময়বহুল মাধ্যম এটি। এরোপ্লেনের ধারণা সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ভারতবর্ষে— রামায়ণ ও মহাভারতে। তবে আধুনিক প্রযুক্তির এরোপ্লেনের আবিষ্কর্তা হিসেবে আমরা রাইট ব্রাদার্সের নাম জানি। প্রচলিত ইতিহাস অনুসারে ১৯০৩ সালে রাইট ব্রাদার্স প্রথম বিমান ওড়াতে সক্ষম হন। কিন্তু আমরা জানলে অবাক হব যে, রাইট ব্রাদার্সের বিমান উৎক্ষেপণের আট বছর পূর্বেই সফল ভাবে বিমান উড়িয়ে দেখান এক ভারতীয়! তিনি হলেন শিবকর বাপুজী তলপড়ে। ১৮৬৪ সালে মুম্বইয়ের চিরাবাজার এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। সংস্কৃত ও বৈদিক সাহিত্যে অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন শিবদাস তলপড়ে প্রাচীন ভারতের বৈদিক পুরাণের খুঁটিনাটি গবেষণা করে সন্ধান পান পুরাণের মোড়কে আবদ্ধ সুপ্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। রামায়ণ- মহাভারতে বর্ণিত বিমানের উপর তিনি গভীর ভাবে চর্চা শুরু করেন। এই সময় মহর্ষি ভরদ্বাজের 'বিমান শাস্ত্র' গ্রন্থটি তিনি পাঠ করেন, যেখানে আটটি অধ্যায়ে তিন হাজার শ্লোকে বিস্তারিত ভাবে বিমান নির্মাণের কৌশল পদ্ধতি ও প্রযুক্তির বর্ণনা পান তিনি। উল্লেখযোগ্য যে, মহর্ষি ভরদ্বাজ বত্রিশটি পদ্ধতির সাহায্যে পাঁচশো রকম বিমান তৈরির বর্ণনা দেন। 'বিমান শাস্ত্র' গ্রন্থ থেকেই তলপড়ে বিমান তৈরির সূত্র আবিষ্কার করেন। আর্থিক দৈন্যদশার মধ্যেও কঠোর পরিশ্রম করে তিনি বিমান নির্মাণে সক্ষম হন। এই বিমানের নাম দেন 'মরুৎ সখা', যার অর্থ বাতাসের বন্ধু। আর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেন পারদ। অবশেষে আসে ১৮৯৫ সালে সেই ঐতিহাসিক দিনটি। মুম্বইয়ের সমুদ্রসৈকতে প্রায় এক হাজার মানুষের সামনে বিমান উড়িয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন তলপড়ে। সকলের দুই চোখকে অভিভূত করে ভূমি ছেড়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে অদ্ভুত যন্ত্রটি! প্রায় পনেরশো ফুট উচ্চতায় উঠতে সক্ষম হয় বিমানটি। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার সেই সময় বিমানটিকে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বেশ কিছুক্ষণ ওড়ার পর এটিকে মাটিতে নামিয়ে আনা হয়। অবশ্য অনেকে বলেন, মাটিতে নামার সময় এটি ধ্বংস হয়ে যায়। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুম্বাই হাইকোর্টের জজ মহাদেব গোবিন্দ রানাডে এবং ভদোদরার রাজা সৈয়জিরাজ গায়কোয়াডের মতো তৎকালীন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব।

শিবদাস তলপড়ের আরও গবেষণার প্রয়োজন ছিল, বাধা ছিল অর্থ। সৈয়জিরাজ তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতায় তিনি এই অর্থ মঞ্জুর করতে ব্যর্থ হন। এরপর সরকার তলপড়েকে বিস্ফোরক তৈরির অজুহাতে গ্রেপ্তার করে। মুক্তি পাওয়ার পর অর্থাভাব এবং মানসিক অতৃপ্তি তাঁকে গ্রাস করে ফেলে। একরাশ ব্যর্থতা হতাশা নিয়ে ১৯১৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এক ভারতীয়ের এই অবিশ্বাস্য আবিষ্কারকে মেনে নিতে চায়নি ব্রিটিশ সরকার। মার্কারি আয়ন ইঞ্জিনে ব্যবহার করে বিমান উৎক্ষেপণের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরকার ফুৎকারে এই বিমান তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে নাসা স্বীকার করে যে মার্কারি আয়নের সাহায্যে মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা সম্ভব।

জানা যায়, লন্ডন থেকে রিলে কোম্পানির কিছু লোক তলপড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। গবেষণায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা সরলমতি এই ভারতীয়ের থেকে বিমান তৈরির নকশা জেনে নেয়। কালক্রমে এই নকশাটি রাইট ব্রাদার্সের হাতে পড়ে এবং তারা এই নকশা থেকে বিমান তৈরি ও উৎক্ষেপণে সাফল্য লাভ করে।

আধুনিক পৃথিবীর উন্নততম মাধ্যম এরোপ্লেন আজ দেশ দেশান্তরের দূরত্ব মুছে দিয়েছে, আর ইতিহাস মুছে দিয়েছে এর আবিষ্কর্তাকে। স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও শিবদাস তলপড়ের জীবনী বা কীর্তির কথা আমাদের ঐতিহাসিকেরা জানার বা জানাবার প্রচেষ্টাটুকু করেননি। ২০১৫ সালের গণতন্ত্র দিবসে 'হাওয়াইজাদা' নামে একটি ছবি মুক্তি পায়। শিবদাস তলপড়ের বিমান আবিষ্কারের কাহিনি প্রতিফলিত হয় ছবিটিতে। ছবি নির্মাতাদের এই সাধু উদ্যোগও আমাদের দেশে শিবদাস বাপুজী তলপড়েকে নিয়ে চর্চার অবকাশ রাখেনি। তিনি এক বিস্মৃত নায়ক হিসেবেই নীরব বিপ্লবের ভূমিকা পালন করেছেন।

—ঋদ্ধিমান রায়,
বহরমপুর মোড়, কলকাতা-৯৬।

কেন্দুপাতা সংগ্রহকারী মহিলাদের জন্য ‘পাদুকা-চরণ’ প্রকল্প

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিবিধতা আছে অন্তহীন। কোনও একটি ঘটনা বা কাজকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকেন রাজনীতিজ্ঞরা। ভালো-মন্দ সব কাজের সমালোচনা করতে ছাড়েন না বিরোধীপক্ষ এবং প্রচারমাধ্যমগুলি। ২০১৪ সালে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পরে মহিলাদের সার্বিক উন্নতিকল্পে কিছু ছোট ছোট প্রকল্প শুরু করে। বিরোধী দলের রাজনীতিজ্ঞরা সেগুলিকে অবশ্যই সুনজরে দেখেনি। বিদ্যালয়ে মেয়েদের ব্যবহারের জন্য শৌচাগার নির্মাণকে মহিলা সশক্তিকরণের পক্ষে প্রাথমিকতা দেবার বিপক্ষে যুবরাজের বক্তব্য ছিল, আমাদের দেশের চৌকিদার শৌচাগারে উঁকি মারেন। তাতে অবশ্য মহিলাদের জন্য শৌচাগার নির্মাণ বা ব্যবহার কোনোটাই কম হয়নি। বরং এর সাফল্য অনতিবিলম্বে সমাজে পরিলক্ষিত হয়। মেয়েরা একটু বড় হওয়ার পর পৃথক শৌচাগার না থাকার জন্য বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হতো। বর্তমানে সেই প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। মেয়েরা স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বিদ্যালয়ে আসতে পারছে। এইভাবে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার-প্রসার বেড়েছে। সেইরকম, উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে গরিব মহিলারা তাঁদের রান্নাঘরে গ্যাসের ব্যবহার শুরু করতে পেরেছেন ও নিজেদের এবং পরিবারের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে সচেতন হয়েছেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মহিলা ক্ষমতায়নের সপক্ষে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়াতে বিপাকে পড়েছেন অনেকেই। কারণ স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে যে পরিবারটি আমাদের দেশে শাসনতন্ত্র চালিয়েছে, তারা মুখে ‘গরিবি হটাও’ ‘বেকারি হটাও’ ‘দুর্নীতি হটাও’ ইত্যাদি স্লোগান দিলেও মন থেকে তারা কখনই চায়নি সেগুলি দেশ থেকে দূরীভূত হোক। আসলে ওইগুলি দেশে থাকলে তাদের শাসনতন্ত্রও কায়েম থাকবে, নতুবা প্রতিবার ভোটের আগে তারাই বা কত নতুন নতুন স্লোগান আমদানি করবে! তার চাইতে বরং এই ভালো, কুমিরের বাচ্চা দেখানোর মতো প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একই দৃশ্য, আগামী ভোটের জন্য সেগুলি জমিয়ে রাখা! বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ায় তাদের এখন বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। বেশ কিছু বাস্তবিক সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলির সমাধান দিতে যখন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে আসছে, তখন বিরোধী পক্ষের বিচলিত হওয়া ছাড়া কোনো রাস্তা আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ছে না।

সম্প্রতি এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে ছত্তিসগড়ের তথাকথিত অবহেলিত জেলা বিজাপুরে। সংবিধানের রূপকার ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের ১২৭ তম জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ‘আয়ুষ্মান ভারতের’ সূচনা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওখানে আসেন। ওই অনুষ্ঠানে ‘পাদুকা-চরণ’ প্রকল্প উপলক্ষ্যে মহিলাদের মধ্যে তিনি চপ্পল বিতরণ করেন। প্রায় একদশক আগে

প্রধানমন্ত্রী নিজ হাতে চপ্পল পরিয়ে দিচ্ছেন এক বৃদ্ধাকে।

শুরু হওয়া এই প্রকল্পে জঙ্গলে কেন্দুপাতা সংগ্রহকারিণী মহিলাদের মধ্যে চপ্পল দেওয়া হয়ে থাকে। বেশ কয়েক হাজার মহিলা এতে লাভবান হয়ে থাকেন। রাজ্যের মাইনর ফরেস্ট প্রোডিটস কর্পোরেশন এই ‘পাদুকা-চরণ’ প্রকল্পটি পরিচালনা করে থাকে। যেসব পরিবার বছরে কমপক্ষে ৫০০ বান্ডিল কেন্দুপাতা সংগ্রহ করেন, সেই পরিবারগুলির সদস্যারা একজোড়া করে চপ্পল পান। এমনই একজন বৃদ্ধাকে পাদুকা-চরণ প্রকল্পে নিজের হাতে চপ্পল পরিয়ে দেন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী! উপস্থিত জনগণ প্রধানমন্ত্রীর এই আচরণে প্রথমে আশ্চর্য হয়ে যান এবং এরপরেই তুমুল হর্ষধ্বনিতে অভিনন্দন জানান। ওই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী পিছিয়ে পড়া জেলা বিজাপুরের ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের সঙ্গে বার্তালাপ করেন এবং তাদের মধ্যে লক্ষ্মী জানিয়েছে যে, সে ড্রোন বানিয়েছে। উৎসাহিত প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে পিছিয়ে পড়া বিজাপুরের এই অত্যাধুনিক অবদানের কথা উল্লেখ করে জানান যে, এই পিছিয়ে পরা জেলাগুলিতে শীঘ্রই নতুন প্রকল্পের সূচনা হতে চলেছে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রতিভাময়ী লক্ষ্মী এবং ওই পরিশ্রমী বৃদ্ধা মহিলা মিডিয়ার কাছে অপরিচিত ছিলেন, কিন্তু প্রধামন্ত্রী তাঁদের প্রতিভা ও কর্মক্ষমতাকে সম্মান জানিয়েছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব আমাদের ঘরের-মেয়ে-বউ, বয়স্কাদের ভালোবাসা ও সম্মান জানাবার। তাঁদের প্রতিভা, কর্মকুশলতা এবং পরিশ্রমকে সম্মান দিলে তবেই আমাদের সমাজের ও দেশের সমগ্র বিকাশ সম্ভব। ▮

নিপা থেকে সাবধান হওয়া প্রয়োজন

ডাঃ কিংশুক গোস্বামী

গত কয়েকদিনে টেলিভিশন ও খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারি নিপা ভাইরাসের আক্রমণে কেরলে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু-র রিপোর্ট অনুসারে ২০১৮ সালে মে মাসে কেরলের কোঝিকোড় থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে পেরম্বরা থেকেই নিপা ভাইরাস ছড়িয়েছে। ওই অঞ্চলে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম মারা যান একজন নার্স। এরপরই সামনে আসে নিপা বৃত্তান্ত।

আসলে কী এই নিপা ভাইরাস? Zoonotic Virus পরিবারের Paramyxoviridae (পশু দেহ থেকে মানব দেহে ছড়ায় যে সব ভাইরাস) অংশ নিপা ভাইরাস (Nipah_Virus or #NiV)

হু'-র রিপোর্ট অনুসারে নিপা বা নিভ প্রধানত বাদুর জাতীয় প্রাণী থেকেই ছড়ায়। নিপা অপেক্ষাকৃত নতুন ভাইরাস যা অতি সহজেই বাদুর জাতীয় তৃণভোজী প্রাণীর থেকে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। শুধুমাত্র বাদুর নয়, নিপা শুয়োরের বর্জ্য থেকেও ছড়ায়।

১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ার প্রথম এই ভাইরাসের প্রকোপ দেখা দেয়। সেখানে বাড়ির পোষ্য কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া, ছাগলের দেহে এই ভাইরাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ওই অঞ্চলে প্রতিটি বাড়িতেই শুয়োর প্রতিপালন হয়। গবেষণায় দেখা যায়, ওই শুয়োরের থেকেই নিপার প্রভাব ছড়িয়েছে পোষ্যদের দেহে। এরপর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

সিঙ্গাপুরেও নিপা ভাইরাস দেখা গিয়েছিল। ২০০৪ সালে নিপা ভাইরাস থাবা বসায় বাংলাদেশে। সেখানে ৩৩ জনের মৃত্যু হয় এর প্রভাবে। হু-র রিপোর্ট অনুসারে, এখনও পর্যন্ত নিপার প্রভাবে ৪৭৭ জন আক্রান্ত হয়েছে। যার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২৫২ জনের।

নিপা ভাইসারের আক্রমণে মৃত্যুর আশঙ্কা শতকরা ৭০ শতাংশ। সাধারণভাবে প্রথমে জ্বর এবং মাথা

যন্ত্রণা ও ঝিমুনিই এই রোগের লক্ষণ। পরবর্তী পর্যায়ে জ্বর বাড়ে ও সেই সঙ্গে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে রোগী। এরপর ধীরে ধীরে কোমাতে চলে যায় সে। আর এরপর মৃত্যু অনিবার্য।

এখনও পর্যন্ত এই রোগের চিকিৎসা বা প্রতিষেধক সঠিক বাজারে আসেনি। ফলে, এর প্রকোপ সেভাবে আটকানো সম্ভব হয় না। তবে, এই নিয়ে বিস্তর গবেষণা শুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে।

ভারতীয় হোমিও চিকৎসক সমাজের মতে রোগের সাথে রোগীর সব লক্ষণ মিলিয়ে পালসেটিলা ২০০, বাইওনিয়া ২০০, জেলসিয়াম ২০০, বেলেডোনা ২০০, আর্সেনিক ২০০, রাসটকস ২০০, হাইওসমাস ২০০, নাক্স ভম ২০০, হোমিও ওষুধগুলো ভালো কাজ দেয়।

সাবধনতা : নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক দ্রুত ছড়াচ্ছে ভারতে। বাতাসে এই ভাইরাস ছড়ানোর কোনও সম্ভাবনা নেই।

(১) একমাত্র নিপায় আক্রান্ত কোনও রোগীর সংস্পর্শে এলেই কেউ নিপায় আক্রান্ত হতে পারেন। আক্রান্ত ব্যক্তি ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোমায় চলে যেতে পারেন। যেরকম ডেঙ্গুতে ইউপোরিয়াটম ২০০ ওষুধ ভালো কাজ দেয় ডেঙ্গু রোগীর ব্লাডের প্লেটলেট কাউন্ট বাড়াতে। (২) শুয়োর থেকে ছড়ায়। তাই শুয়োরের মাংস কাটার সময় সাবধান থাকতে হবে। গত বছর ৫ অক্টোবর ২০১৭-তে শিলিগুড়িতে 'রহস্যজনক' জ্বরে মানুষ মরছে, তা অনেকটাই নিপা ভাইরাস ঘটিত মনে করা হয়। (৩) বাদুড়ে খাওয়া আম, লিচু বা কোনও ফল খেলে বিপদ হতে পারে। (৪) ফলমূল ভালো করে দেখে কিনুন ও গরম জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে খান। (৫) গরমকালে এই রোগ বেশি ছড়ায়। (৬) ডাক্তার ও নার্সরা হাতে গ্লাভস পরুন সবসময়। (৭) মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন।

ভয়াবহতা :

কেরলে দ্রুত ছড়াচ্ছে ভয়ঙ্কর নিপা ভাইরাস। মৃতের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কেরলের কোঝিকোড়ে ওই ভাইরাসের প্রকোপে ৩ জনের মৃত্যুর পর এবার আরও মৃত্যুর খবর আসছে রাজ্যের উত্তর প্রান্ত থেকেও। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী উত্তর কেরল-সহ এখন পর্যন্ত রাজ্যে মৃতের সংখ্যা হয়েছে ১১।

কোঝিকোড় থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে পেরাম্বরা হাসপাতালের এক নার্স মারা গিয়েছেন নিপা ভাইরাসের প্রকোপে। এখন পর্যন্ত কোঝিকোড়েই মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। অন্যদিকে, মাল্লাপুরমে ৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে।

পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজির বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, কোঝিকোড়ে নিপা ভাইরাসের অস্তিত্ব মিলেছে। কোঝিকোড়ে মৃত ২ ব্যক্তির রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে তা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। কলকাতা তথা বাংলা জুড়েও হাই অ্যালার্ট জারি আছে।

ফোন নং : ৯১৫৩৪৮২৬০৬

মমতার ইন্ধনে রক্তস্নাত পশ্চিমবঙ্গ

সুব্রত চট্টপাধ্যায়

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস যে সন্ত্রাস শুরু করেছিল, এখনও তা অব্যাহত। এখনও বহু জায়গায় ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীরা ঘরে ফিরতে পারেননি। যেসব বিজেপি প্রার্থী জয়ী হয়েছেন প্রকাশ্যে তাদের অথবা তাদের পরিবারের লোকজনকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। পুলিশকে জানিয়েও কোনও সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসন সব জেনেও নীরব। সন্ত্রাসের ভয়াবহতার প্রকৃত ছবি তুলে ধরার জন্য এই লেখায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা হলো।

২.৪.২০১৮

সুতাহাটা, তমলুক

পুলিশের সামনেই তৃণমূলের গুণ্ডারা এদিন বিজেপির তমলুক জেলা সভাপতি প্রদীপ দাস এবং সাধারণ সম্পাদক মানস রায়কে বেধড়ক মারধর করে। ওরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাচ্ছিলেন।

বীরভূম

রামপুরহাট

বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল এবং ব্লক সভাপতি মুকুল মুখোপাধ্যায় তৃণমূলের আক্রমণে আহত হন। গুরুতর আঘাত পান দুই কর্মী অভয় রায় এবং নীলকান্ত বিশ্বাস।

নলহাটি

সেন্টু ঘোষকে একাধিকবার মারধর করা হয়।

দুবরাজপুর

সন্দীপ আগরওয়াল এবং জয়ন্ত আচার্য মারাত্মক আহত হন।

লাভপুর

কৃষ্ণহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, এস বাট্টাল, রফিক শেখ এবং বিপত্তারণ পালকে ব্যাপক মারধর করা হয়। সঞ্জীব সেন নামে এক কর্মীর পা ভেঙে যায় এই ঘটনায়।

৩.০৪.২০১৮

সিউড়ি, বীরভূম

এদিন বিজেপির জেলা সম্পাদক কালোসোনা মণ্ডলকে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করে তৃণমূলের গুণ্ডারা।

ময়ূরেশ্বর

সাঁইথিয়ার মণ্ডল সভাপতি প্রহৃত হন।

হুগলী

এসডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় বিজেপি প্রার্থী বিলাস লখনকে ধাক্কা মেরে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। একই ঘটনা ঘটে হেমন্ত বাগ এবং অনুপ সাঁতরার ক্ষেত্রেও। আরামবাগের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অসিত কুণ্ডু প্রার্থীদের সাহায্য করার জন্য বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন। তাকে চ্যাংদোলা করে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তৃণমূলের গুণ্ডারা মাংসকাটার বড়ো বড়ো ছুরি আর বন্দুক হাতে সারাক্ষণ বিডিও এবং এসডিও অফিস ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশ দেখেও কিছু বলেনি।

মুর্শিদাবাদ

লালবাগ

জেলা সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক আক্রান্ত হন।

ডোমকল

বিজেপির এক কার্যকর্তাকে লোহার রড দিয়ে পেটায় তৃণমূলের গুণ্ডারা। মাথায় গুরুতর আঘাত নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

পূর্বমেদিনীপুর

নন্দীগ্রাম

ঘটনাস্থল বিরুলিয়ার ২নং ব্লকের রুক্মিণী গ্রাম। আট মাসের

বীরভূমে বিজেপির জেলা সম্পাদক কালো সোনা মণ্ডলের ওপর হামলা।

নিহত অজিত মুর্মু।

অন্তঃসত্ত্বা শ্রীমতী বুলি গুড়িয়ার শ্লীলতাহানি করে তৃণমূলের গুণ্ডারা। পরে মারধরও করা হয়। তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাচ্ছিলেন। তার বাড়ি ভাঙচুর করে তৃণমূলের গুণ্ডারা।

দাঁতন

বিজেপির কার্যকর্তা মির রবিউলকে মারধর করে তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা।

বাঁকুড়া

খাতরা

বিজেপি নেতা গৌতম মণ্ডল গুরুতর আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

৪.৪.২০১৮

বীরভূম

বোলপুর

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় বিজেপি প্রার্থীদের আক্রমণ করা হয়। তাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিতেই পারেননি।

ঝাড়গ্রাম

নয়াগ্রামের বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিলে তাদের নৃশংসভাবে মারধর করা হয়।

বসিরহাট

সন্দেশখালির বিজেপি প্রার্থীদের মারধর করে তাদের বাড়িতে লুটপাট চালানো হয়।

উত্তর দিনাজপুর

রায়গঞ্জে বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেবার সময় বাধা পান। এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি এবং গোলাগুলি চলে।

কোচবিহার

বিডিও অফিসের সামনেই তৃণমূলের গুণ্ডারা বিজেপি প্রার্থীদের রাস্তায় ফেলে পেটায়। সাংবাদিকরাও আক্রান্ত হন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সুনীল মুর্মু মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

বাঁকুড়া

তৃণমূলের হামলায় রানিবাঁধের অজিত মুর্মু মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরের দিন তার মৃত্যু হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের গুণ্ডারা বিজেপি পার্টি অফিসের সামনে বোমাবাজি করে। বাইকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি

চালসা

তৃণমূলের গুণ্ডাদের আক্রমণে বিজেপি নেতা বিষ্ণু রায় মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু এই ঘটনায় প্রকৃত অপরাধীদের না ধরে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এক বিজেপি নেতাকে।

বর্ধমান

রানিগঞ্জ

ওবিসি মোর্চার সভাপতি মহাদেব মাঝি মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে প্রহৃত হন। তাকে আসানসোল সদর হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়েছে।

৫.৪.২০১৮

কোচবিহার

কাঁচামারি গ্রামের বিশ্বজিত বর্মণকে নৃশংসভাবে মারধর করা হয়। মস্তিষ্কের তিন জায়গায় রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এছাড়া নাক মুখ ও কানের ফুটো দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। কয়েকবার রক্তবমিও করেন। বহুদিন তাঁকে মিশন হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর

রায়গঞ্জের সাঁওতালপাড়ায় বিজেপি প্রার্থী বীরেন সোরেনের বাড়িতে আগুন লাগানো হয়। অবাধ লুটপাটও চলে।

কোচবিহার

আনদারাম পাখিডাঙার বিজেপি প্রার্থী বাবুল সরকার ও ইন্দ্র সরকার মারাত্মক জখম হন। তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়েছে।

হুগলী

চন্দননগর

রাজ্য ওবিসি মোর্চার সভাপতি স্বপন পাল এবং ৩৫ জন কার্যকর্তার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বসিরহাট

হাড়োয়া

বিজেপির মহিলা মণ্ডলের সভাপতি প্রহৃত হন। বিজেপি প্রার্থী কণিকা মণ্ডলকে অপহরণ করা হয়।

৬.০৪.২০১৮

বাঁকুড়া

জেলা শাসকের অফিসে যাওয়ার পথে বিজেপির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাজু ব্যানার্জি ও সঞ্জয় সিংহ এবং রাজ্য সম্পাদক শ্যামাপদ মণ্ডলকে গাড়ি থেকে নামিয়ে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয়। পরে তাঁরা হাসপাতালে ভর্তি হন।

বীরভূম

নলহাটি

বিজেপি কার্যকর্তাদের লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি চালায়। কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো হয়। এসডিপিও নিজে গুলিচালনায় অংশ নেন। বহু কর্মী আহত হন।

বাউটিয়া

লাল্টু দাসের বাইকে জয় শ্রীরাম লেখা একটা ফ্ল্যাগ লাগানো ছিল। সেই অপরাধে পুলিশ তার পিছু নেয়। ভীত লাল্টু বাইক থেকে পড়ে যান। উলটো দিক থেকে আসা ট্রাক তার মাথা থেঁৎলে দিয়ে চলে যায়। এছাড়া আরও একজন কার্যকর্তা প্রহৃত হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন।

৭.০৪.২০১৮

ঝাড়গ্রাম

ধানঘোড়িতে বিজেপির নেত্রী সীতা বাগের বাড়িতে মাঝারাতে চড়াও হয় তৃণমূলের গুণ্ডারা। তার শ্লীলতাহানি করা হয়। মার খান পরিবারের সদস্যরা।

৮.০৪.২০১৮

হাওড়া গ্রামীণ

দেবীবল্লভপুর, ডোমজুড়

টিএমসি-র গুণ্ডারা বিজেপির জেলাপরিষদ প্রার্থীর বাড়িতে লুটপাট চালায়। তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয় এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়।

আমতা

এখানেও জেলা পরিষদ প্রার্থী আক্রান্ত হন। তাকে হুমকিও দেওয়া হয়।

৯.০৪.২০১৮

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

বারুইপুর

বিজেপি প্রার্থীর মেয়ের শ্লীলতাহানি করে তৃণমূলের গুণ্ডারা।

পশ্চিম মেদিনীপুর

গোপীবল্লভপুর ঝাড়গ্রাম

বিজেপি প্রার্থী কবিতা কিসকুকে অপহরণ করা হয়। তিনি মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে যাচ্ছিলেন।

পূর্ব মেদিনীপুর

গোয়ালতোড়

বিজেপি প্রার্থী যমুনা মুর্মুর স্বামীকে খুন করা হয়। তার আগে তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছিল, গ্রামে থাকতে হলে বিজেপি করা যাবে না।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

লক্ষ্মীকান্তপুর, পাথর প্রতিমা

বিজেপি প্রার্থীর প্রস্তাবক সুশান্ত প্রধানকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা হয়। পরে তিনি হাসপাতালে মারা যান।

২২.০৪.১৮

দক্ষিণ দিনাজপুর

বালুরঘাট

বিজেপির মণ্ডল কমিটির সদস্য গোপাল গুঁইকে মারধর করে চলন্ত ট্রাক্টরের নীচে ফেলে

সিবিআই তদন্ত চাই : মণিকা কুমার

প্রথমেই বলব আমার স্বামী দুলাল কুমার খুন হয়েছেন। পুলিশ যা বলছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। তিনি আত্মহত্যা করেননি। সংসার জীবনে তিনি যথেষ্টই সুখী ছিলেন। দুই ছেলে আর এক মেয়েকে নিয়ে আমাদের ভরাট সংসার। কোথাও যদি তার কোনও অভাববোধ থাকত তাহলে স্ত্রী হিসেবে আমিই সবার আগে জানতে পারতাম। আমি হলপ করে বলতে পারি এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যার জন্য তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই আমাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। কখনও ফোনে আবার কখনও বাড়িতে চড়াও হয়ে। কয়েকবার মারধরও করা হয়। মারধোর মানে কিন্তু শুধু সাধারণ চড়থাপ্পড় নয়। একদিন তো তৃণমূলের গুণ্ডারা লাঠিসোটা নিয়ে ওকে বেধড়ক পেটাল। উনি আহত হয়ে ঘরবন্দি হয়ে পড়লেন। কিন্তু এত অত্যাচার সত্ত্বেও ওকে মুহূর্তের জন্য দমে যেতে দেখিনি। অসম্ভব সাহসী ছিলেন। দলের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। বলরামপুরে বিজেপি যে এত ভালো ফল করল তার পিছনে আছে ওর পরিশ্রম, ওর ত্যাগ। অসম্ভব ভালো মানুষ ছিলেন। এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন, বিশ্বাস করুন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। আমার শ্বশুরমশাইয়ের দোকান আছে। সেদিন আমার স্বামী গিয়েছিলেন বাবাকে খাবার দিতে। এক ঘণ্টা কেটে যাবার পরেও ফিরছেন না দেখে আমি ফোন করি। ফোনটা কেটে যায়। পরে বাইরে বেরিয়ে দেখি ওর সাইকেলটা রাস্তার ধারে পড়ে আছে। জানতে পারলাম ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। যারা করেছে তারা সবাই তৃণমূলের আশ্রিত গুণ্ডা। দুদিন পর ওর মৃতদেহ বিদ্যুতের খুঁটিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। পুলিশ এখন বলছে উনি আত্মহত্যা করেছেন। একদম বাজে কথা। তৃণমূলের গুণ্ডাদের আড়াল করার জন্য গল্প ফাঁদছে পুলিশ। পুলিশের ওপর আমার বিন্দুমাত্র ভরসা নেই। আমি সিবিআই তদন্ত চাই। সিবিআই তদন্ত না হলে প্রকৃত অপরাধীরা ধরা পড়বে না।

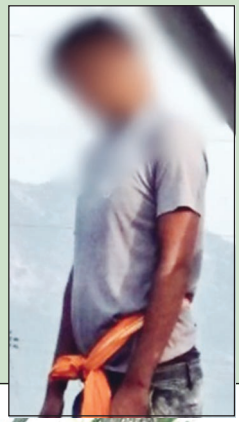

মৃত দুলাল কুমারের স্ত্রী (খাটিয়ায় বসে) ও ছেলে। (ইনসেটে) মৃত দুলাল কুমার।

দেওয়া হয়। তিনি মারা যান।

২৩.৪.১৮

বীরভূম

সিউড়ি

শেখ দিলদার গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। শ্যামসুন্দর মণ্ডলের হাতে গুলি লাগে। অন্য একটি ঘটনায় কালোসোনা মণ্ডল মাথায় আঘাত পান। তাকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করাতে হয়েছে। কমবেশি আরও ১৫ জন আহত হন।

২৯.০৪.১৮

নদীয়া

শান্তিপুর

বিজেপি প্রার্থী জয়শ্রী বিশ্বাসের বাড়িতে হামলা চালায় কয়েকজন দুষ্কৃতী। তাকে না পেয়ে আক্রমণ করা হয় অন্যান্যদের ওপর। অবাধে ভাঙচুর চলে। জ্যোৎস্নাদেবীর ননদ প্রীতিকা বিশ্বাসের শ্লীলতাহানি করা হয়। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

ত্রিলোচন মাহাতোর মতো একজন তরুণ নেতার মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। প্রতিহিংসাপরায়ণ শাসকের জন্য একটি সম্ভাবনাময় জীবন শেষ হয়ে গেল। তৃণমূলের পোষা গুণ্ডাদের মতের সঙ্গে তার মত মেলেনি তাই তাকে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ত্রিলোচনের পরিবারকে বলতে চাই সারা দেশের বিজেপি কর্মীরা আপনাদের পাশে আছে।

অমিত শাহ,
বিজেপির
সর্বভারতীয় সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্র মোদী বিরোধী জোটের অন্যতম প্রধান নেতা। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কর্মীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় এই সরকার ব্যর্থ। এমনকী মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাবার মতো হৃদয়ও এই সরকারের নেই। আমরা মৃত দুলালকুমারের পরিবারের পাশে আছি।

স্মৃতি ইরানি,
কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী

তৃণমূলী সন্ত্রাসের জবাব দেবেন সাধারণ মানুষই : শতপথী

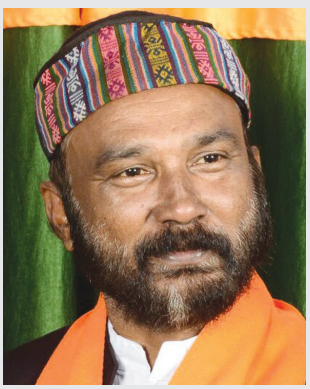

সুখময় শতপথী
বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি

সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম জেলায় বিজেপির অভূতপূর্ব সাফল্য কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ঝাড়গ্রাম সহ জঙ্গল মহল অঞ্চলে তৃণমূলকে মানুষ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন একথা হজম করা শাসক দলের রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষে সহজ হচ্ছে না। তারই প্রতিফলন ঘটছে শাসক দলের গুণ্ডামি আর সন্ত্রাসের মাধ্যমে। বেছে বেছে বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও নেতাদের উপর নেমে আসছে আক্রমণের ঘটনা। বহু কর্মী-সমর্থক ঘরছাড়া। পুলিশ দিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে, অকারণে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে আমাদের কর্মীদের। তৃণমূলের গুন্ডারা আক্রমণ করলেও বিজেপিকেই আক্রমণকারী হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে। আক্রমণের শিকার হচ্ছে পার্টি অফিসগুলি। আমাদের কোনও অভিযোগই নিতে চাইছে না পুলিশ। জয়ী বিজেপি প্রার্থীদের নানাভাবে দল ভাঙানোর চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্যের শাসক দল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনওভাবেই তাদের চেষ্টা সফল হবে না। এখানকার সাধারণ মানুষ যেভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদের শিক্ষা দিয়েছেন আগামী দিনেও তৃণমূলকে উপযুক্ত জবাব দেবেন তারা।

৭.৫.১৮

উত্তর দিনাজপুর

চোপরা

প্রচার শেষে বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান বিজেপি কর্মী আমিরুল ইসলাম।

১১.৫.২০১৮

পুরুলিয়া

বলরামপুর

জেলার জনজাতি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ টুডুকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু তিনি মারা যান।

বাঁকুড়া

লক্ষ্মীসাগর অঞ্চল

দিনের শেষে বাড়ি ফেরার সময় বিজেপি নেতা অজিত ঘোষ আক্রান্ত হন। তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

১২.০৫.১৮

পশ্চিম মেদিনীপুর

কেশিয়ারি উত্তর মণ্ডল

বিজেপির জনজাতি মোর্চার অঞ্চল প্রেসিডেন্ট মনু হাঁসদাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

১৩.০৫.১৮
পশ্চিম মেদিনীপুর
তাতলপুর, দাসপুর

তাতলপুরের বুথ সম্পাদক সুখদেব মাইতিকে খুন করে তৃণমূলের গুণ্ডারা।

১৪.০৫.১৮
মুর্শিদাবাদ - বেলডাঙা

ভোট দিতে যাবার সময় বিজেপি নেতা তপনকুমার মণ্ডলকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

কোচবিহার - গোপালপুর

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে প্রহৃত হন বিজেপি নেতা দুলাল ভৌমিক। পরে মারা যান।

উত্তর দিনাজপুর
সিকন্দরপুর

বিশু টুডু গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

১৯.৫.১৮
নদীয়া - চাপরা

জয়দেব প্রান্তিকে হত্যা করে তৃণমূলের গুণ্ডারা।

২৪.৫.১৮
শান্তিপুর

বিজেপির বুথ সভাপতি বিপ্লব শিকদার গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তৃণমূলের গুণ্ডারা মাঝরাতে বাড়িতে চড়াও হয়ে সবার সামনে তাকে খুন করে।

২৯.৫.১৮
পুরুলিয়া - বলরামপুর

বিজেপির যুবনেতা ত্রিলোচন মাহাতোকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর গাছের ডালে তাঁর মৃতদেহ ঝুলিয়ে দিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ত্রিলোচনের বাবা হরিরাম মাহাতো বিজেপির মণ্ডল সচিব।

১.৬.১৮
পুরুলিয়া - বলরামপুর

বিজেপির জনজাতি মোর্চার নেতা দুলাল কুমারকে হত্যা করে তৃণমূলের গুণ্ডারা। এই ঘটনার কিছুদিন আগে তিনি দলের থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৬.৫.১৮
দক্ষিণ দিনাজপুর - ডুগডুগি

বিজেপি নেতা উত্তম বর্মণকে হত্যা করা হয়।

(লেখক বিজেপির রাজ্য সংগঠন সম্পাদক)

দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই : হরিরাম মাহাতো

আমার ছেলে ত্রিলোচন মাহাতোকে যেভাবে খুন করা হয়েছে সেটা একমাত্র পেশাদার আততায়ীদের পক্ষেই সম্ভব। দুঃখের বিষয়, তৃণমূল কংগ্রেস এখন পেশাদার আততায়ীদেরই দল। গ্রামেগঞ্জে যেখানেই যান দেখবেন মানুষ ভয়ে চুপ করে আছে। ছেলের প্রসঙ্গে প্রথমেই বলব, অল্পবয়েসেই ও গ্রামের সবার ভরসাস্থল হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত ওর জনপ্রিয়তা দেখে ওরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক হত্যা আমরা অনেক দেখেছি। কিন্তু আমার ছেলেকে খুন করার পিছনে যে নৃশংস মানসিকতা কাজ করেছে তাতে মনে হয় খুনিরা এবং তাদের মাথারা মারাত্মক চাপে ছিল। রাজনৈতিক জমি হারিয়ে ফেলার চাপ। আমার ছেলেকে ওইভাবে খুন করে ওরা সম্ভবত ওদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকেই খুন করতে চেয়েছে। আমি বাবা। আঠারো বছরের ছেলের অকালমৃত্যুর যন্ত্রণা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ছেলে বলে গেল, 'স্যারের নোটস জেরক্স করে আমি এখনই আসছি।' এক ঘণ্টা কেটে গেল ছেলে আর ফেরে না। রাত আটটা নাগাদ ফোন করে বলল, 'কয়েকটা লোক আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। ওরা আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে।' পরেরদিন গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় ছেলেকে পেলাম। পিঠে কাগজ সাঁটা। তাতে কী লেখা ছিল সেসব তো আপনারা জানেন। এখানে বলে রাখি, পঞ্চায়েত ভোটের অনেক আগে থেকে ওরা আমার ছেলেকে হুমকি দিচ্ছিল।

শুধু ছেলেকে নয় আমাদের পরিবারের সবাইকেই দিয়েছে। পুলিশকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। ছেলের মৃত্যুশোকে আমি ভেঙে পড়েছিলাম। কিন্তু পরে আবার উঠে দাঁড়িয়েছি। মাথায় আমার আগুন জ্বলছে। আমি দোষীদের কঠোরতম শাস্তি চাই। এমন শাস্তি যাতে ভবিষ্যতে আর একজন ত্রিলোচন মাহাতোর গায়ে হাত দেবার আগে আততায়ীর বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে। তা সে যতই শাসকের হাত তার মাথার ওপর থাক না কেন।

মৃত ত্রিলোচন মাহাতোর বাবা-মা। (ইনসেটে) মৃত ত্রিলোচন মাহাতো।

এই সময়

কৃষকের পাশে

কেন্দ্রীয় সরকার আরও একবার কৃষকদের সাহায্যে এগিয়ে এল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে,

কেন্দ্র তপশিলি জাতি ও জনজাতি তালিকাভুক্ত এবং উত্তরপূর্ব ক্ষেত্রে বসবাসকারী কৃষকদের ১৫,০০০ কোটি টাকা ঋণ দেবে। মাত্র ৭ শতাংশ বার্ষিক সুদে সেই ঋণ শোধ করা যাবে। সময়ের আগে শোধ করলে সুদের হার হবে ৪ শতাংশ।

তোষণে বিপদ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সম্প্রতি কাশ্মীর সফর করে এলেন। এই সফরে তিনি জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতি পরবর্তী রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে

পর্যালোচনা করেন। স্বারাষ্ট্র মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, আলোচনার পথ খোলা রাখলেও সরকার তোষণনীতি বরদাস্ত করবে না।

উপকূলে সতর্কবার্তা

দেশের অনেক জায়গায় বর্ষা এসে গেছে। দারুণ গরম থেকে রেহাই মিলেছে। কিন্তু তারই মধ্যে সতর্কবার্তা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

কারণ দক্ষিণ কোঙ্কন, গোয়া এবং কর্ণাটকের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই বৃষ্টি বিপর্যয়ের চেহারা নিতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

সমাবেশ -সমাচার

গোপালী আশ্রমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সেবা প্রশিক্ষণ শিবির

গত ২৪-২৭ মে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সেবা প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের সন্নিকটে গোপালী আশ্রমে। শিবিরে দেশের ২৯টি রাজ্য থেকে ৯৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। শিবিরের উদ্‌ঘাটন করেন খড়্গপুর

আই আই টি-র ভূবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অনিল গুপ্তা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকর্তাদের মধ্যে পথনির্দেশ করেন কেন্দ্রীয় উপাধ্যক্ষ চম্পত রায় ও বালকৃষ্ণ নাইক, কেন্দ্রীয় মহামন্ত্রী মিলিন্দ পরাণ্ডে, কেন্দ্রীয় সংগঠনমন্ত্রী বিনায়ক দেশপাণ্ডে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সহসেবা প্রমুখ মধুকররাও দীক্ষিত, কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী তথা সহ সেবা প্রমুখ আনন্দ হরবোলা ও আনন্দপ্রকাশ গোয়েল, নন্দলাল লোহিয়া, কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী ধর্মপ্রসার সুধাশু পট্টনায়ক, কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ গোপাল ঝুনঝুনওয়ালা, কেন্দ্রীয় সৎসঙ্গমন্ত্রী বসন্ত রথ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা দিশার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রমোদ কুলকার্ণী। পথনির্দেশ করেন বালকৃষ্ণ নাইক ও মধুকরজী। ৬০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি শিবির পরিদর্শন করেন।

স্বর্গীয় যুগলকিশোর জৈথলিয়া দ্বিতীয় পুণ্যতিথি স্মরণ

বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রেরণাদাতা যুগলকিশোর জৈথলিয়ার দ্বিতীয় পুণ্যতিথি স্মরণে গত ১ জুন শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের সভাকক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় স্বর্গীয় জৈথলিয়াজীর প্রখর মেধা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও কর্মপ্রেরণার উল্লেখ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন যোগেশরাজ উপাধ্যায়, হিমা বজাজ, সঞ্জয় রাস্তাগী, রামচন্দ্র আগরওয়াল, সুধা জৈন,

এই সময়

জবাবদিহি

ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়াই ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কীভাবে তার ব্যক্তিগত তথ্য অন্য উদ্দেশ্যে

ব্যবহার করতে পারেন? সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ এই প্রশ্নের জবাব দাবি করেছেন ফেসবুক-প্রধান মার্ক জুকেরবার্গের কাছে। উল্লেখ্য, বহু মানুষ সম্প্রতি ফেসবুকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন।

চীনে মোদী

চীনের কুইংডাও শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সাংহাই কোঅপারেশন অরগানাইজেশনের

সদস্য রাষ্ট্রগুলির শীর্ষবৈঠক। ২০১৭ সালে ভারত সদস্য হবার পর এটাই সাংহাই কোঅপারেশনের প্রথম বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রানি আনারস

রানি আনারসকে ত্রিপুরার প্রধান ফল বলে ঘোষণা করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এটি একটি বিশেষ প্রজাতির আনারস। ত্রিপুরার উদয়পুরে রাষ্ট্রপতি মাতাবাড়ি থেকে সাবরুম পর্যন্ত জাতীয় সড়কের উদ্বোধন করেন। নিজের ভাষণে তিনি বলেন, মানবসম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু সমন্বয় করে চলতে পারলে ত্রিপুরার উন্নতি হবে।

অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, নন্দকুমার লঢ়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ভগীরথ চাণ্ডক। সভা পরিচালনা করেন শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বংশীধর শর্মা। অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার রাষ্ট্রীয় চিন্তন বৈঠক

গত ২৬-২৭ মে রাঁচির সরলা বিড়লা প্রাঙ্গণে অখিল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার রাষ্ট্রীয় চিন্তন বৈঠক সম্পন্ন হয়। বৈঠকে যোজনার সর্বভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্তল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ঈশ্বরশরণ বিশ্বকর্মা, সংগঠন সম্পাদক বালমুকুন্দ পাণ্ডে, পূর্ব ক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক কমলেশ দাস-সহ ১৭০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অধ্যাপক স্মৃতি কুমার সরকার, অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ-সহ পাঁচ জন উপস্থিত ছিলেন। দুদিন ব্যাপী বৈঠকে ইতিহাস চর্চার রূপরেখা, পুরাণে প্রাপ্ত ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, জনজাতীয় ইতিহাস, এশিয়া মহাদেশের ইতিহাস, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারতের কৃষিক্ষেত্র, জাতীয় সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক

সঙ্ঘের সহসরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে কার্যপদ্ধতি ও কার্যকর্তা বিকাশ সম্বন্ধে পথনির্দেশ করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-সহ রাঁচীর বহু বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যপাল মহোদয়া ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশার ইতিহাস সংক্রান্ত দুটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

নবীন প্রতিভার অন্বেষণে সিউড়ি সংস্কার ভারতী

নবীন প্রতিভার অন্বেষণে সংস্কার ভারতীর সিউড়ি শাখা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে বীরভূম জেলা ব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। গত ২-৩ জুন প্রতিযোগিতার আসর বসে সিউড়ি সরোজিনীদেবী সরস্বতী শিশু মন্দির প্রাঙ্গণে। বীরভূম ব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় জেলা থেকে ছোটদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সংগীত, নৃত্য, অঙ্কন, আবৃত্তি বিষয়ে একাধিক বিভাগে ১১৩৫ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। বিপুলসংখ্যক প্রতিযোগীকে উৎসাহ দিতে প্রতি বিভাগে দশজন করে পুরস্কৃত করার উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থা। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল গীতি, লোকগীতি, আধুনিক গানের পাশাপাশি আবৃত্তির তিনটি বিভাগ, নৃত্যের মোট চারটি বিভাগে লোকনৃত্য, রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে নৃত্যের মতো বিভাগ যেমন রয়েছে, তেমনই অঙ্কনের তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অঙ্কনের বিচারক রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী নিমাই দাস। নৃত্যের বিচারক ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী কাবেরী পুইতুণ্ডী, লক্ষ্মী রায়, গার্গী দাস প্রমুখ। সংগীত বিভাগের বিচারক ছিলেন বর্ধমানের পদ্মজা নাইডু মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষ শিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখার সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী বলেন, গত ১২ বছর ধরে সংস্কার

এই সময়

রক্ষক নির্মলা

সেনাবাহিনীর আশু প্রয়োজন মেটাতে ৫,৫০০ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করলেন

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। যেসব সাজসরঞ্জাম বাহিনীর এখনই প্রয়োজন এই টাকায় তা কেনা হবে। ১২টি দূরপাল্লার র‍্যাডার কেনারও প্রস্তাব রয়েছে।

প্লাস্টিক দূষণ

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এবারের বিষয় ছিল, 'প্লাস্টিকের দূষণ'। ভারতে প্লাস্টিকের ব্যবহার

মারাত্মক। বড়ো শহরগুলোতে জায়গায় জায়গায় প্লাস্টিকের পাহাড় জমে যায়। তাই রাষ্ট্রপুঞ্জ এবারের পরিবেশ দিবসে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে ভারতকে। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য চলছে নানা ওয়ার্কশপ।

জবাব দিন

ত্রিলোচন মাহাতো এবং দুলাল কুমারের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখে সারা দেশ শিউরে উঠেছিল।

রাজ্য সরকারের নির্লিপ্ততায় বিস্ময় আরো বেড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য চুপ করে বসে নেই। জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত দুই যুবকের মৃত্যুর কারণ জানতে চেয়েছে কেন্দ্র।

ভারতী বীরভূম জেলা ব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। মূল লক্ষ্য হলো জেলার নবীন প্রতিভার অন্বেষণ করে তাদের সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়া।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের জেলা সমাহর্তাকে স্মারকলিপি

সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কর্তব্যরত প্রিসাইডিং অফিসার শিক্ষক রাজকুমার রায়ের রহস্যজনক মৃত্যুর সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ গত ২৩ থেকে ৩০ মে-র মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলা সমাহর্তার মাধ্যমে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। নির্বাচনে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিরাপত্তা

সুনিশ্চিত করা নতুবা নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া, মৃত শিক্ষকের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান ও আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা সহ মোট ১২ দফা দাবি জানানো হয়। স্মারকলিপির অনুলিপি রাজ্যপাল, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মানসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনারের কাছে পাঠানো হয়। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলতেই থাকবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অরূপ সেনগুপ্ত। গত ১৬ জুন বিকেল ৩টায় কলকাতার 'ভারতসভা'র সভাগৃহে এই সংক্রান্ত একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাঁকুড়া শহরে বীর সাভারকররের জন্মদিন উদ্‌যাপন

গত ২৮ মে বাঁকুড়া শহরের রানিগঞ্জ মোড়ে বীর সাভারকরের মূর্তির পাদদেশে সারাদিন নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় বীরের জন্মদিন। বাঁকুড়া জেলা হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সকালে গৈরিক পতাকা উত্তোলন করেন হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট সদস্য ব্যোমভোলা বরাট। বীর সাভারকরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন বাঁকুড়া জেলা হিন্দু মহাসভার শহর সম্পাদক শান্তি অধিকারী, উপপৌরপিতা দিলীপ আগরওয়াল-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বিকালে আত্মরক্ষামূলক লাঠি ও ছোরা খেলা দেখতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। বিশিষ্ট লাঠি ও যোগ শিক্ষক মন্মথ দত্তকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় সভা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সূর্য রতন গণের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বিদ্যুৎ দত্ত, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল, হিন্দু মহাসভার জেলা কার্যকরী সভাপতি সমীর কুমার দাস ও হিন্দু মহাসভার জেলা সম্পাদক সোমনাথ বরাট। বীর সাভারকরের নীতি অনুসারে হিন্দু জাতিকে যোদ্ধা জাতিতে গড়ে তোলার জন্য বিদ্যালয় স্তর থেকে সামরিক শিক্ষা প্রচলনের দাবি জানানো হয়। দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন ভারতীয় সংস্কৃতি চক্রের সম্পাদক বৃন্দাবন বরাট।

অম্বুবাচী : নববর্ষা বরণ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

হিন্দুদের প্রতিটি পূজা অনুষ্ঠানই ঋতুভিত্তিক। ঋতুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই হয় বেশিরভাগ অনুষ্ঠান। এই সব পূজা অনুষ্ঠানের আয়ত্ত একটি বৈশিষ্ট্য— এগুলি সবই দ্বিমাত্রিক। প্রতিটি অনুষ্ঠানেরই দুটি দিক। তার একটি ব্যক্ত, অন্যটি প্রচ্ছন্ন। এই দুটি দিকের একটি হলো আধ্যাত্মিক, অন্যটি ব্যবহারিক। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে ধর্মের ব্যাপারটি এবং এই দিকটি অবশ্যই প্রত্যক্ষ বা ব্যক্ত। ব্যবহারিক দিকটির সঙ্গে বেশিরভাগ সময়ই জড়িয়ে থাকে স্বাস্থ্য এবং জীবনচর্যার বিভিন্ন দিক। শাক্ত আচারের সঙ্গে যুক্ত এবং বিশেষ করে বাঙালি, অসমিয়া এবং উত্তরপূর্ব ভারতের অধিবাসীদের অন্যতম অনুষ্ঠান অম্বুবাচী সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়।

অম্বুবাচীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেবী কামাখ্যার বিশেষ পূজা, উৎসব, মেলা। অন্যদিকে এর সঙ্গে আছে বেশ কিছু বিধিনিষেধ পালনের নির্দেশ। এইসব নিয়ম-বিধি, নির্দেশ বা আচার অনুষ্ঠানের অন্যতম রান্না করা কোনও খাবার না খাওয়া। তিনদিন ফলমূল খেয়ে প্রায় আধবেলা উপোস করেন বিশেষ করে হিন্দু বাঙালি বিধবারা। ব্রাহ্মণ ও যতীরা প্রায় একই ভাবে পালন করেন অম্বুবাচী। অথচ স্মৃতিশাস্ত্র গুলিতে রান্না বন্ধ বা ভাত ইত্যাদি খাওয়া বর্জনের কোনো নির্দেশই নেই বলে মনে করেন পণ্ডিত মণ্ডলী।

বিশেষ করে হিন্দু বাঙালি প্রায় অর্ধাশনে থেকে অম্বুবাচী পালন করলেও, যে কারণে এই উৎসবের বা আচরণবিধির সূচনা সেটি কিন্তু প্রায় উপেক্ষিতেই থেকে যায়। সমাজবিজ্ঞানী এবং বুধমণ্ডলীর ধারণা, অম্বুবাচী প্রকৃতপক্ষে একটি কৃষি-উৎসব। আর সেই কারণেই পৃথিবী এসময় রজঃস্বলা হয় বলে ধরে নিয়ে এই তিনদিন বন্ধ থাকে হলকর্ষণ। অন্য কথায় বছরের এই তিনটি দিন হলো কৃষকের ছুটির দিন।

বর্ষার আগমনকে নির্দেশ করে অম্বুবাচী। এই শব্দটির আভিধানিক একটি অর্থ হলো

জল বা জলসিক্ত। যদিও এর অন্য অর্থে একটি বিশেষ তিথি পালনের শাস্ত্রীয় বিধির কথা বলা হয়েছে। বঙ্গদেশে সাতই আষাঢ় থেকে তিনদিন এবং ওড়িশায় জ্যেষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে তিনদিন সময় কালকে অম্বুবাচী বলা হয়। ওড়িশায় অবশ্য এর নাম রজ উৎসব। সাধারণভাবে এই সময়ের আশেপাশেই বঙ্গদেশে বর্ষা আসে। যে কারণে অম্বুবাচীকে বর্ষা বরণের অনুষ্ঠান বলেও চিহ্নিত করা হয়। আর তাই এই উৎসব মূলত কৃষককুলের জন্য, এমনটাই মনে করেন সমাজবিজ্ঞানীরা। অথচ বাঙালি হিন্দুর কাছে এটি হলো বিধবাদের অতি অবশ্য পালনীয় একটি ব্রত। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং পতী সন্ন্যাসীদের অনেকে এই তিনটি দিন পালন করেন বিধবাদের মতোই পরমনিষ্ঠায়।

সাধারণভাবে অম্বুবাচীতে রান্না করা বা উনুন জ্বালানো হয় না। এমনকী অগ্নিপক্ক বা রান্না করা কোনো খাবারও খান না বিধবারা। অনেকে অম্বুবাচীর আগেই তৈরি রুটি, লুচি, খই, চিড়ে, মুড়ি ইত্যাদি এবং মরশুমি ফল খেয়ে এই তিনটি দিন কাটান। অতি গোঁড়ারা গুড় চিনিও বর্জন করেন নিষিদ্ধ বিধায়। এই তিনদিন তাঁদের খাদ্য কেবলমাত্র কাঁচা দুধ ও ফলমূল। বস্তুত এই তিনটি দিন পুরো না হলেও প্রায় অর্ধ-উপবাসে কাটে হিন্দু বাঙালি বিধবাদের।

অথচ আশ্চর্য, পণ্ডিতরা অনেক খুঁজেও প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রগুলিতে খাদ্য বর্জনের এ জাতীয় কোনো নির্দেশ পাননি। স্মৃতিশাস্ত্র গুলিতে অম্বুবাচীর সময় সমস্ত চাষবাস বন্ধ রাখার কথাই শুধু আছে। পঞ্জিকার অবশ্য একটি বচনে যতী, ব্রতী, বিধবা এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে অম্বুবাচীতে রান্না খাবার না খাওয়ার কথা আছে। কিন্তু এই বচনের উৎস উল্লেখ করা হয়নি কোথাও। রঘুনন্দন বা

অন্য স্মৃতিকারদের গ্রন্থেও এর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বাংলার বৃহস্পতি রায়মুকুট শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য এবং ওড়িশার গদাধর প্রমুখ স্মার্ত পণ্ডিত-প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে অম্বুবাচীর বিস্তৃত বিবরণ আছে। প্রাচীন প্রমাণের উল্লেখ করে এঁরা অম্বুবাচীর সময় হলকর্ষণ, বীজবপন, ভূখনন ইত্যাদি নিষিদ্ধ বলেছেন। অর্থাৎ এই সময়ের কৃষকের ছুটির কথা বলা হলেও কোনো জায়গাতেই বিশেষ করে বিধবাদের রান্নাখাবারের নিষেধের কথা নেই।

ষোড়শ শতকের রঘুনন্দনের আগের যুগের স্মৃতিকথা তো গোবিন্দানন্দজী স্পষ্ট বলেছেন, 'আধুনিকরা বলেন, এই সময় পৃথিবী অপবিত্র হয়। তাই যদি হয় তাহলে তো খাওয়া-দাওয়া সবই নিষিদ্ধ হত।' এর থেকে মনে হয়, অন্তত ষোড়শ শতকেও অম্বুবাচীতে রান্না খাবার খাওয়ায় কোনো মানা ছিল না। এটি সম্ভবত পরবর্তী যুগের লোকাচার।

গোবিন্দানন্দরও বহু আগে রচিত দেবী ভাগবতে আছে—

অম্বুবাচ্যাং ভূখননং জলশৌচাদিকঞ্চ যে।

কুর্বন্তি ভারতবর্ষে ব্রহ্মহত্যাং লভন্তিতে।। (৯।৩৪।৪৯)

এখানেও অম্বুবাচীতে ভূ-খনন বা জলাশয়ে শৌচকর্ম করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু খাদ্য সম্পর্কে কোনো নির্দেশ নেই। এরই সূত্রে কৃত্যতত্ত্বে আষাঢ়কৃত্য সম্পর্কে রঘুনন্দনের বিধান,—

তত্র অধ্যয়নং বীজবপনং ন কার্যং'।

এসব থেকেই সমাজ ও নৃ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আদিতে অম্বুবাচী ছিল শুধুই কৃষি উৎসব। ওই তিন দিন কৃষকদের ছুটি দিয়ে নববর্ষাকে স্বাগত জানানো হতো। নানা আমোদ প্রমোদ, নৃত্য-গীত ইত্যাদি লোকানুষ্ঠান। একদা ছিল যা বর্ষাবন্দনা ও কৃষির উৎসব, কালে সম্ভবত পুরোহিততন্ত্রের বিধানে তা পরিণত হয় প্রায় উপবাসের মতো এক কৃচ্ছ্রসাধনে।

অম্বুবাচীর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে দেবী কামাখ্যার কাহিনি। গুয়াহাটি থেকে তিন-চার কিলোমিটার দূরে ব্রহ্মপুত্রনদের বাঁ তীরে নীলাচল, নীল বা নীলকূট পাহাড়ে রয়েছে দেবী কামাখ্যার মন্দির। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামাখ্যার নামেই এই মন্দির। দশমহাবিদ্যার এক বিদ্যা— দেবী কামাখ্যা। একান্ন শাক্ত পীঠের অন্যতম এই দেবীপীঠ। কালিকা পুরাণ মতে, কুব্জিকা পৃষ্ঠে পড়েছিল বিষ্ণুচক্রে খণ্ডবিখণ্ডিত সতীর যোনিদেশ। তারই ফলে পাহাড় নীল হয়ে ওঠে। যোনি দেশের ভারে কুব্জিকা পাহাড় মাটিতে প্রোথিত হলে ব্রহ্মা তাকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। তাঁর চেষ্টায় পাহাড়ের চূড়াগুলিই শুধু উত্থিত হয়।

কালিকা পুরাণেই আছে, দেবী কামাখ্যাই প্রকৃতি রূপে সমস্ত জগৎকে নিয়োজিত করছেন। 'কামার্থমাগতা যন্মান্ময়্য সার্দ্ধং মহাগিরৌ'। শিবের সঙ্গে কাম চরিতার্থ করার জন্য মহামায়া এই মহাগিরিতে এসেছিলেন বলেই এই নীলকূট পাহাড়ে নির্জনস্থা দেবী কামাখ্যা নামে পরিচিত। দেবী কামাখ্যা কামিনী, কামদা কামা, কান্তা ও কামাদি দায়িনী। ইনি কামাঙ্গনাশিনী— তাই কামাখ্যা নামে পরিচিত।

পৃথিবীপুত্র নরকাসুর প্রথম তাঁর আরাধ্যা কামাখ্যা দেবীর মন্দিরটি তৈরি করেন। ১৫৬৫-তে একটি সংস্কার করেন রাজা নারায়ণ।

দেবী কামাখ্যার সঙ্গে হয় কামেশ্বরের বিবাহ। সেই উৎসব স্মরণ করেই কামাখ্যায় পৌষ মাসে হয় পৌষরিয়া উৎসব, বসন্তে বাসন্তী উৎসব, আষাঢ়ে অম্বুবাচী এবং শরতে দুর্গাপূজা।

অম্বুবাচী উপলক্ষে কামাখ্যায় বসে মহামেলা। দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ আসেন তখন এখানে। আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে সূর্য যখন আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদ ভোগ করেন সেই সময় অর্থাৎ তিনদিন কুড়ি দণ্ড সময়কাল অম্বুবাচী নামে খ্যাত। অম্বুবাচীর সঙ্গে কামাখ্যার মহামেলা জড়িয়ে রয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে। অম্বুবাচীর চারদিন দেবী মন্দির বন্ধ থাকে। চারদিন পর মন্দির আবার খোলা হয়। সে কারণেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষের এই অম্বুবাচীর মহামেলা চলে আরও কয়েকদিন। সব মিলিয়ে কামাখ্যায় অম্বুবাচী মেলা আজ এক সর্বভারতীয় উৎসব। ■

পরলোকে প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার

গত ৫ জুন রাত্রি ১টা ১০ মিনিটে শিলিগুড়ির 'মাধব ভবনে' লোকান্তরিত হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। ১৯৩৭ সালে কলকাতার বেলেঘাটায় তাঁর জন্ম। ১৯৬৪ বাণিজ্য বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর সঙ্ঘের প্রচারক জীবনের ব্রত গ্রহণ করেন। প্রথমে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর নগর প্রচারক। পরে হুগলী জেলা প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে শিলিগুড়ি সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে মুখ্য শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করার পর মালদা বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার পুরো সময় কারারুদ্ধ থাকেন। পরে ২৪ পরগনা বিভাগপ্রচারক, পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত সেবা প্রমুখ, উত্তরবঙ্গের ধর্মজাগরণ প্রমুখ এবং শেষে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৬ জুন শিলিগুড়িতেই তাঁর মরদেহের দাহকার্য সম্পন্ন হয়।

চিরঞ্জীবী মার্কণ্ডেয়

অমিত ঘোষ দস্তিদার

ভৃগুকুলজাত মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয় পিতার কাছ থেকে পৈতে প্রাপ্তির পর সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করতে থাকেন। সেই অধ্যয়ন আজকের দিনের অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী-শংসাপত্র প্রাপ্ত অধ্যয়ন নয়। সেই অধ্যয়ন ছিল উপলব্ধির, সেই অধ্যয়ন ছিল জানার আকঙ্ক্ষা— জানার বাসনা, তৃপ্তি-অতৃপ্তিজাত অধ্যয়ন। যা ছিল তপস্যা। যে তপস্যা ছিল অটল। তপস্যা এবং স্বাধ্যায়ে নিরত থেকে হৃষীকেশের আরাধনায় মত্ত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন বলে সুদুর্জয় মৃত্যুকেও তিনি প্রতিহত করতে পেরেছিলেন।

ক্লান্তিহীন মার্কণ্ডেয় পরমাত্মা পরমপুরুষের এমন ধ্যান করতে থাকেন যে ত্রিলোক বিস্মিত হয়ে যায়, বিমুগ্ধতায় ভরে যায় বিশ্বচরাচর। হিমালয়ের উত্তর দিকে পুষ্পভদ্রানদীতীরে বিচিত্র শিলায় তৈরি মার্কণ্ড আশ্রম হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক নন্দনকানন। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ইত্যাদি সবকিছু ভেঙে খানখান হয়ে নিরহংকার তপঃতেজে মুখরিত হতে থাকে চারিদিক। পার হয়ে যায় অযুত-নিযুত বছর আর মন্বন্তরের পর মন্বন্তর। তবু চলতে থাকে সাধনা। অঙ্ক কষে বাস্তব-অবাস্তবের চোখ মারামারির কোনও প্রয়োজন নেই, শুধু 'সাধনা' শব্দটাকেই ঠিকমতো গলাগলি করতে পারার ক্ষমতা থাকলেই উপলব্ধি করতে পারা যাবে। আর তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই চৈতন্যের উদয় ঘটবে। তা না হলে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে তো সবকিছু অধরাই থেকে গেল আজও। না পারার অজ্ঞানতাকেই ঢাকতে আজ বুঝি মূর্খদের আদালতে সবাই হতে চায় জোটবদ্ধ। নর ও নারায়ণের উপস্থিতি আজও যে স্তব্ধবাক-ক্রিয়াশূন্য করে দেয় যা কিছু ক্ষণিকের অহংকারকে। সমস্ত সৃষ্টির নিয়ামক আজও একই ভাবেই নিজে সৃষ্টি করে আবার নিজ-দেহেই সৃষ্টির সংহার করে চলেছেন। স্থাবর -জঙ্গমের সেই ঈশ্বর সাধনা আজও চলছে। মার্কণ্ডেয় আজও ধ্যানরত, আর তাঁর ধ্যান ভাঙানোর জন্য, বিঘ্ন ঘটানোর জন্য মত্ত হয়ে আছে অনেকেই। কিন্তু মত্ততায় বিশ্বাসীজনেরা নিজেরাই দ্বিধাচ্ছন্ন। উল্টে তাদের আত্মবিশ্বাসে ধরে যায় চিড়, আর মন থেকে মনে জমে যাচ্ছে সংশয়ের মেঘ।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় আজও অবস্থান করছেন ভারতীয় হৃদয়ে। বিগতকালের মতো আজও মহামুনি মার্কণ্ডেয়র ভয়ে পালিয়ে চলেছে তারা, যারা যুগ থেকে যুগে এমনকী আজও শোষণ, মোহন, সন্দীপন, তাপন এবং মাদনপূর্ণ পঞ্চবানকেই তাদের প্রধান অস্ত্র হিসাবে বগলদাবা করে ছুটে চলেছে। আর ভারতীয় হৃদয়জাত মহামুনি মার্কণ্ডেয় আজও তাদের হীনপ্রভ করে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। যা দেখে পঞ্চবান বগলে চাপা বিস্মিতজনেরা আজও দূরত্বে থেকে বৃথা আস্ফালন করে চলেছেন।

উপনষিদে ঋষি মানুষকে অমৃতের সন্তান বলে সম্বোধন করা

হয়েছে— আত্ম-উপলব্ধি, সসীমের অসীমে উত্তরণ সর্বত্র একই মহাসত্যের দর্শন। যে দর্শন মার্কণ্ডেয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই মহাসত্যকে তিনি আজও আমাদের সকল জ্ঞানে, সকল কর্মে, সকল প্রেম-ভক্তিতে ধ্রুবতারা গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন। আজও আমাদের সামনে যেমন মহাসত্য প্রকটিত, তেমনি মহাভয়ও বজ্রের মতো উদ্যত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের কখনই নয়। এর প্রমাণ পরম্পরাগত ভাবে ভারতীয় ঋষিজনেরা স্মরণাতীতকাল থেকে আজও আমাদের দিকে মেলে রেখেছেন। পরম পবিত্র সত্ত্বগুণ শম, দম, সত্য, পরোপকার, তপস্যা, সহিষ্ণুতা ও তত্ত্বজ্ঞান এই আটটি সাধনা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। অন্তর্যামীভূমা, বিষ্ণুরূপী বিশ্বগুরু, পরমদেব নরোত্তমঋষি, শুক্লরূপ নারায়ণ, সংযতবাক, পরমদেবতাকে মানব কল্যাণে বারবার প্রণাম করেছেন। মার্কণ্ডেয়র পাতা আসনে ঈশ্বর এসে বসেছেন সুখাসনে। মার্কণ্ডেয় বার বার ঈশ্বরকে মানুষের ভব-ভয় কাটিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়েছেন। আজও তিনি মানুষের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর দর্শনের আহ্বান জানাচ্ছেন। চিরজীবী মার্কণ্ডেয় বেদ-উপনিষদের উদাত্তবাণীর সুরঝংকার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে তা পাঠিয়ে দিচ্ছেন মানুষের কাছে। মানুষকে তিনি আজও মহামিলনের, মহাসমন্বয়ের, মহামুনির জন্য মহাজাগরণ ঘটাতে বলছেন। আজও তিনি বলে চলেছেন—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'। বৈদান্তিক উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও উদাত্তধ্বনিত আহ্বান আমাদের চৈতন্যের বোধোদয় ঘটাক। আমরা যে মার্কণ্ডেয়র পরম্পরাগত সন্তান সেটুকু অন্তত প্রমাণিত হোক। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

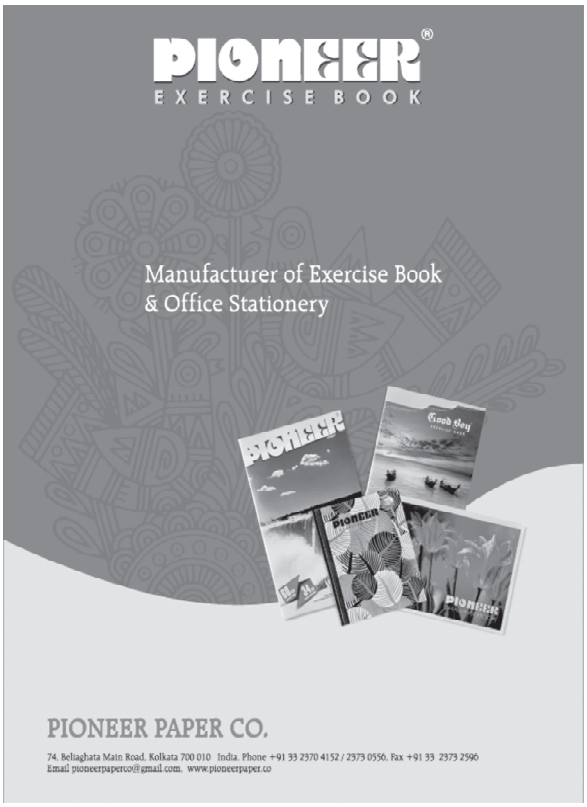

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

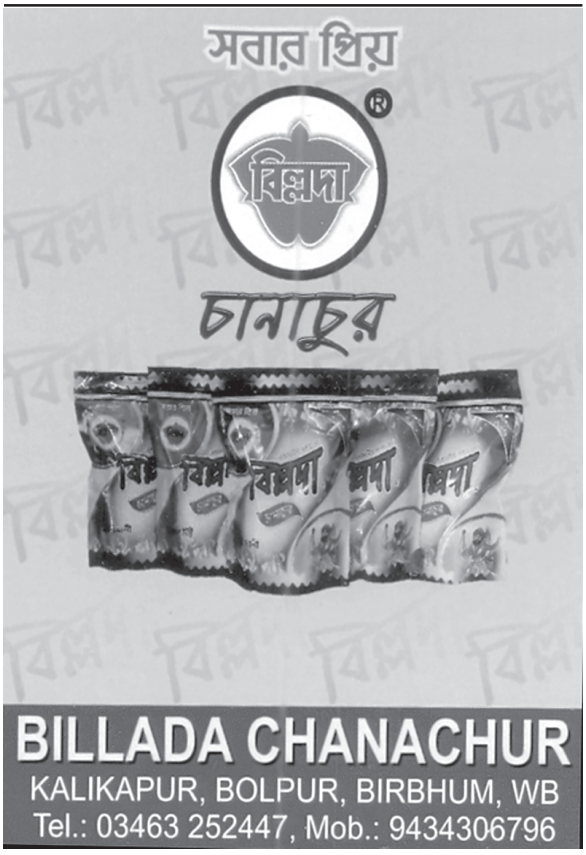

কাঁটা তারের ওপার থেকে

বিরাজ নারায়ণ রায়

সুকোমলবাবু নিয়ম করে রোজ সকালে তিন কিলোমিটার হাঁটেন। ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে বেরিয়ে পড়েন, ফিরতে ফিরতে সাড়ে ছ'টা-সাতটা বেজে যায়। প্রতিদিনের এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয় না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পালপাড়ার কাঁচা রাস্তা ধরে সোজা গিয়ে ওঠেন বর্ডারের রাস্তায়। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে বিএসএফ ক্যাম্প পর্যন্ত যান, তারপর আবার ফিরে আসেন। এদিকটাতে লোকবসতি তেমন নেই। সকালের আবহাওয়াও বেশ মনোরম। খোলামেলা পরিবেশে একা একা আপন মনে বেড়িয়ে আসা যায়। পিচ ঢালা সরু রাস্তাটা কাঁটাতারের বেড়া বরাবর সমান্তরাল ভাবে সোজা চলে গেছে। ডিউটিতে আসা বিএসএফ-দের সঙ্গেও ভালো পরিচয় হয়ে গেছে সুকোমলবাবুর। ফেরার সময় রোজ দেখা হয়, ডিউটি শেষ করে ওরা ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে।

স্থানীয় বিডিও অফিসে কেরানির চাকরি করতেন সুকোমল হাজরা। চার বছর হলো রিটায়ার করেছেন। স্ত্রী গত হয়েছেন পনেরো বছর হবে। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে। জামাইয়ের চাকরির সূত্রে সে কলকাতায় থাকে। একমাত্র ছেলে সৌরভ একটি স্কুলে পড়ায়। বছরখানেক হলো তারও বিয়ে হয়েছে, ছেলেপুলে এখনো হয়নি।

একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন সুকোমলবাবুর। সারাদিন বাড়িতে টুকটাক কাজ করে বিকেলে গিয়ে বসেন ঘোষের চায়ের দোকানে। এছাড়া আর তেমন কোনও কাজ নেই। সকালে এই হাঁটাহাঁটির ব্যাপারটা নতুন যোগ হয়েছে ডাক্তারের নির্দেশে। ডাক্তার বলেছেন রোজ সকালে একটু হাঁটাহাঁটি করতে হবে, নইলে শরীর ঠিক থাকবে না। চাকরি জীবনে সুকোমলবাবুর কোনোদিন সকাল ওঠা অভ্যাস ছিল না। বরাবরের ওই বেলা আটটায় ওঠা তারপর কোনওরকমে বাজারটা এনে দিয়ে স্নান-খাওয়া করে অফিস। প্রথম দিকে উঠতে খুব কষ্ট হতো। কিন্তু এখন আগের মতো আলস্য ভাবটা আর নেই। চারটে বাজলে ঠিক ঘুম ভেঙে যায়। অভ্যেস হয়ে গেছে। এছাড়া ঘুম ভাঙার অন্য একটা কারণও আছে, সেটা হলো মসজিদ থেকে আসা মাইকে আজানের শব্দ। গ্রামে আগে একটা মসজিদ ছিল। এখন দুদিকে আরও দুটো হয়েছে। এই তিনের ডাকে বিছানায় শুয়ে থাকা বড় দায়।

।। দুই।।

প্রতিদিনের মতো আজও সুকোমলবাবু অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়লেন। শরৎকাল, উত্তরবঙ্গে এই সময় সকালের দিকে একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা করে। তাই চাদরখানা তিনি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। এত ভোরে বাড়ির কেউ ঘুম থেকে ওঠে না। দু-একজন ছাড়া রাস্তাতেও তেমন কেউ নেই। দুরে অনেকগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই একটা সুবাস নাকে এলো। রাস্তার উল্টো দিকের শিউলি গাছ দুটোতে ফুল ফুটেছে, তারই মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। সেদিকে ভালো করে একবার তিনি দেখলেন, গাছের তলাটা ফুলে ঢাকা। যেন কেউ ফুলের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। সুকোমলবাবু কয়েকবার বুক ভরে শ্বাস নিলেন, তারপর হাঁটা শুরু করলেন।

হাঁটতে হাঁটতে পালপাড়া ছাড়িয়ে গিয়ে উঠলেন বর্ডারের রাস্তায়। এদিকটা আরো বেশি ফাঁকা। কোথাও একটা দুটো পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে মাত্র।

সুকোমলবাবু এবারে জোরে জোরে পা চালাতে লাগলেন। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই একটা বিপত্তি ঘটলো। পার্টা যেন কীসের উপর পড়ে পিছলে গেল। অমনি আছাড় খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিলেন। পিছন ফিরে দেখেন এক গাদা কাঁচা গোবরের উপর তিনি পা দিয়েছেন। আর তাতেই এই বিপত্তি। শুধু এক জায়গায় নয়, সারা রাস্তা জুড়েই গোবরের ছড়াছড়ি। ভাবলেন, কাল রাতে নিশ্চয় দালালরা ওপারে গোরু চালান করেছে, তা না হলে এতো গোবর কোথা থেকে আসবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সুকোমলবাবু, কোমরে বা পায়ে কোথাও তেমন চোট লাগেনি।

আজ আর বেশিদূর এগোলেন না। একটু গিয়েই ফেরার রাস্তা ধরলেন। এরকম পা বাঁচিয়ে কতক্ষণ হাঁটা যায়? বর্ডারের রাস্তা থেকে নেমে আবার পালপাড়ার কাঁচা রাস্তা ধরেই বাড়ি ফিরতে হয়। কিন্তু কিছুদূর এসেই সুকোমলবাবু থমকে দাঁড়ালেন। নন্দনদের বাড়ির পিছনে ফাঁকা জায়গাটায় কীসের যেন একটা জটলা তৈরি হয়েছে? কোনও মহিলার কান্নার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। এত সকালে আবার কার কী হলো? কৌতূহলবশত রাস্তা থেকে নেমে ধানখেতের আলপথ ধরে এগিয়ে গেলেন। ততক্ষণে পূব আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। সূর্যদেবের উদয় হলো বলে। ভোরের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে তিনি ভালো করে দেখার চেষ্টা করলেন। সবই চেনা মুখ। ওরা নিজের মধ্যে কী সব বলাবলি করছে।

আরও এগিয়ে গেলেন সুকোমলবাবু। দেখলেন নন্দনের মা খেতের ধারে বসে কাঁদছে। তিনি ঠিকই অনুমান করেছেন কাল রাতে দালালরা ওপারে গোরু পাচার করেছে। গোরুর পাল নন্দনের দু-বিঘে ধান পুরো মাড়িয়ে দিয়ে গেছে। এক-একটা গোরুর পাল মানেই হাজার- পনেরোশো গোরু। অতগুলো

গোরু কোনও ধানখেতের উপর দিয়ে যাওয়া মানে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এই সময় ধানগাছগুলি পোয়াতি হয়। কদিন বাদেই ধানের শিষ বেরোবে। আর তার আগে এই সর্বনাশ।

নন্দনের মা গোরুর দালালদের শাপ-শাপান্ত করছে আর কাঁদছে। নন্দন বিমর্ষ মুখে আলোর উপর বসে। ওদে সম্বল বলতে এক চিলতে ভিটে, আর কয়েক বিঘে ধানজমি। তাই দিয়েই মা-ছেলের সারা বছরের খোরাক জোটে। নন্দন চাষের সময় চাষ করে, বাকি সময় মজুর খাটে।

নন্দনের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে সুকোমলবাবুর খুব খারাপ লাগলো। কী বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। জমির উপর দিয়ে গোরু চালান করে ফসল নষ্ট করাটা এখানে নতুন নয়। প্রশাসনকে অনেকবার জানানো হয়েছে, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্থানীয় নেতারাও এসব কথা কানে তোলে না। কারণ, ওরা নিজেরাই এসবের সঙ্গে যুক্ত। পার্টিফান্ড থেকে শুরু করে পার্টি মাস্তানদের পকেটমানি সবই আসে এই কারবার থেকে।

সুকোমলবাবুদের পাড়া থেকে কয়েকশো গজ দূরেই বাংলাদেশ। এদিক থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। মাঝে একটা কাঁটাতারের বেড়া মাত্র। সেটাও সব জায়গায় নেই। কাঁটাতারের ওপারে গ্রামের অনেকেরই চাষের জমি আছে। ভোটার কার্ড জমা দিয়ে ওপারে চাষ করতে যেতে হয়, আবার সময়মতো ফিরে আসতে হয়। নজরদারির জন্য ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে, বিএসএফ জওয়ানরা মাঝে মাঝে টহল দিয়ে যায়। গোরুপাচার, চোরাচালানের জন্য আজকাল একটু কড়াকড়ি বেড়েছে। কিন্তু তা শুধু দিনের বেলাতেই, রাতে গোটা এলাকা চোরাচালানকারীদের মুক্তাঞ্চল। নেতাদের চাপে বিএসএফ-কে তখন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকতে হয়। কয়েক মাস আগেই গোরু পাচার করতে গিয়ে বিএসএফ-এর গুলিতে একজন পাচারকারী মারা যায়। পরের দিন ওরাও দুজন জওয়ানকে পিটিয়ে মেরে ফেললো।

সুকোমলবাবু অবশ্য কোনোদিনই এসব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি। চাকরি, নিজের পরিবার নিয়েই জীবনের বেশিরভাগ সময়টা কাটিয়ে দিলেন। আর এখন শরীর স্বাস্থ্যের যা অবস্থা তাতে সকালে হাঁটতে যাওয়া আর সন্ধের তাসের আড্ডা ছাড়া বাইরে বেরোনো প্রায় বন্ধই দিয়েছেন।

নন্দনদের ওখান থেকে ফিরতে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল। বাড়ি এসে তিনি হাতে পায়ে জল দিয়ে একধামা মুড়ি আর গুড় নিয়ে খেতে বসলেন। তখনই বাড়িতে ঢুকলো অতুলের বউ। এবাড়িতে খুব যাতায়াত আছে ওদের। বাড়িতে কলাটা লাউটা যাই ফলুক না দিয়ে খায় না। নিজে এসে দিয়ে যায়, নয়তো মেয়েটার হাতে পাঠিয়ে দেয়।

অতুলের বউ উঠোনে পা দিতেই সুকোমলবাবু বললেন— ''কী গো বৌমা, আজ তোমার মেয়েকে সকালে শিউলিতলায় দেখলাম না যে, আজ বোধহয় ফুল কুড়োতে আসেনি।''

অতুলের বউ উতলা হয়ে বলল— ''গিয়েছিল তো। আমি তো ওকেই খুঁজতে এলাম। সেই কোন ভোরে বেরিয়েছে এখনো বাড়ি ফেরেনি। ভাবলাম তোমাদের বাড়িতে আছে তাই ডাকতে এলাম।''

অতুলের বউয়ের কথা শুনে রান্নাঘর থেকে সুকোমলবাবুর বউমা বেরিয়ে এলো, বললো— ''না, আমাদের বাড়িতে তো আসেনি। দেখোগে পাড়ায় কোথাও খেলতে লেগে গেছে।''

এবছরই ক্লাস নাইনে উঠেছে অতুলের মেয়েটা। নাম নয়না। খুব মিশুকে। সুকোমলবাবুর সঙ্গে খুব ভাব তার। দাদু-নাতনির সম্পর্ক। দুজনের মধ্যে হাসি ঠাট্টাও হয়। এবাড়িতে কোনও বাচ্চা না থাকায় এই জায়গা অনেকটা নিয়েছে নয়না।

অতুলের বউ মেয়েকে খুঁজতে বেরিয়ে গেল। সুকোমলবাবুও স্নানের জন্য গায়ে তেল মাখতে বসে গেলেন।

তারপর সারাদিন কেটে গেছে। সকালের ঘটনাটা আর মাথায় আসেনি। সন্ধ্যেবেলা সৌরভ স্কুল থেকে ফিরে খবর দিল অতুলের মেয়েটাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি। সকাল থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে কোথাও নেই। কথাটা সুকোমলবাবু যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না। সকালে ভেবেছিলেন ওইটুকু মেয়ে কোথায় আর যাবে, বেলা হলে ঠিক ফিরে আসবে। কিন্তু এখনো পাওয়া যায়নি শুনে শঙ্কায় ভেতরটা কেঁপে উঠলো। বললেন— ''ওরা আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে ভালো করে খোঁজ নিয়েছে তো?''

সৌরভ বলল— ''সব নেওয়া হয়ে গেছে। আমি এখন বেরোচ্ছি, থানায় যেতে হবে একবার। যা দিনকাল পড়েছে তাতে কী থেকে কী হয় কিছুই বলা যায় না। থানায় জানিয়ে রাখা ভালো।''

সৌরভ তাড়াহুলো করে বেরিয়ে গেল। সুকোমলবাবু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন সদর দরজায়।

।। তিন।।

যখন থেকে শিউলি ফুটতে শুরু করেছে রোজ ভোরে দেখা হয় নয়নার সঙ্গে। সুকোমলবাবু হাঁটতে বেরোন আর নয়না শিউলিতলায় আসে ফুল কুড়োতে। সাজি ভর্তি করে ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যায়। সুকোমলবাবু মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেন— ''রোজ এত ফুল তুই কার জন্য নিয়ে যাস বলতো?''

নয়নাও তেমনি উত্তর দেয়— ''কেন, আমার ঠাকুরের জন্য।''

সুকোমলবাবু বলেন— ''কে তোর ঠাকুর, কী নাম শুনি তার?''

দাদুর কথায় নয়না লজ্জা পেয়ে যায়। কপট রাগ দেখিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় সেখান থেকে।

রাত দশটা বেজে গেল। সৌরভ তখনও বাড়ি ফেরেনি। সুকোমলবাবু অস্থির হয়ে উঠেছেন। অতুলের বউয়ের কথা মনে পড়তেই মনটা আরও ভারী হয়ে গেল, হতভাগী বোধহয় কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। ঘড়ি দেখলেন, রাত এগারোটা। থানায় কী হলো, কিছু একটা খবর না পেলে তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। আজ সকালে নয়নার সঙ্গে শিউলিতলায় দেখা হয়নি। তার মানে আজ এদিকে ও আসেনি। মেয়েটা তাহলে গেল কোথায়?

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ সৌরভ বাড়ি ফিরলো। সুকোমলবাবু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে— ''কীরে, পুলিশ কী বলল? কোনও খোঁজ পাওয়া গেল মেয়েটার?''

সৌরভকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। সারাদিন স্কুল করার পর রাতে আবার এই থানা পুলিশ। খুব ধকল গেছে। বলল— ''একটা ডায়েরি করা হয়েছে, পুলিশ খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। বিএসএফ-কেও জানানো ব্যাপারটা। ওরাও খোঁজ করছে।''

—''পাওয়া যাবে তো মেয়েটাকে?''

—''দেখা যাক কাল সকালে কী হয়।'' এই বলে সৌরভ ঘরে চলে গেল।

পরদিন চারটের আগেই ঘুম ভেঙে গেল সুকোমলবাবুর। ভোরের আলো ফোটেনি। চারিদিক তখনো অন্ধকার। একটু আলো ফুটতেই বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে আসতেই রাস্তার উল্টোদিকের শিউলি গাছদুটির দিকে চোখ গেল। তলাটা আজও ফুলে ফুলে ভরে আছে। বাতাসে ফুলের গন্ধ। দাঁড়িয়ে পড়লেন সুকোমলবাবু। গত পরশুও মেয়েটার সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছিল। তিনি যখন যাচ্ছিলেন নয়না তখন সাজি ভর্তি ফুল নিয়ে রাস্তায় উঠছিল। তিনি হাঁক দিয়ে বলেছিলেন— ''কীরে মেয়ে, এত ভোরে ফুল কুড়োতে আসিস তোর ভয় করে না?''

নয়না মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিল— ''কেন, আমি তো জানি তুমি এখান দিয়েই যাবে, তাই ভয় করে না।''

সত্যিই তো সুকোমলবাবু রোজ এই সময় এখান দিয়েই যান, আজও যাচ্ছেন। চারিদিকের সবকিছু যেমন থাকার কথা তেমনি আছে, নেই কেবল নয়না। ভিতরটা যেন কুঁকড়ে উঠলো। মনে হচ্ছে নয়না হারিয়ে যায়নি, ওর কিছু হয়নি। কোথাও যেন সে লুকিয়ে আছে, এক্ষুণি হয়তো হাসতে হাসতে এসে বলবে— ''দাদু, কেমন চমকে দিলাম সবাইকে।''

সুকোমলবাবু হাটতে হাঁটতে কখন বিএসএফ ক্যাম্প ছাড়িয়ে চলে এসেছেন খেয়ালই করেননি। এতদূর সাধারণত তিনি আসেন না। এদিকটায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ এখনো শেষ হয়নি। খোলা বর্ডার। আধ কিলোমিটার বা তারও দূরে দূরে একজন করে বিএসএফ দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে কাঁটাতার বরাবর। রাস্তা থেকে বাঁদিকে নেমে কিছুটা এগিয়ে গেলেই বাংলাদেশের সীমানা। সুকোমলবাবু সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। সামনের ধানখেত সবুজ হয়ে আছে। সুকোমলবাবুর মনে নানা ভাবনা ঘুরপাক খেতে লাগল। সারাবছর ধরে গ্রামের কত মানুষ এখানে চাষ করে। কিন্তু সেই ফসল ঘরে উঠবে কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। ধান পাকতে শুরু করলেই ওপার থেকে বাংলাদেশীরা এসে রাতের অন্ধকারে কেটে নিয়ে যায়। গোরু পাচারের মতো আপদ তো আছেই। কিন্তু তাই বলে গ্রামের কেউ জমি পতিত রাখে না। চাষিরা আশায় আশায় প্রতি বছর চাষ করে। তারপর লুঠ হয়ে যায় ফসল। বছরের পর বছর ধরে চলছে এই পরিহাস।

ফেরার সময় সুকোমলবাবু একবার অতুলদের বাড়িতে ঢুঁ দিলেন। অতুলের বউ দাওয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে, সারারাত ঘুমোয়নি। অতুল বাড়িতে নেই, গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে গেছে। সুকোমলবাবুকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো বউটা। সুকোমলবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— 'কেঁদো না, ঠিক পাওয়া যাবে ওকে।'

এই প্রবোধটুকু ছাড়া কী-ই বলবেন। যতক্ষণ না একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তো কিছুই করা যাচ্ছে না।

অতুলদের বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন। রাস্তার মোড়ে কয়েকটা ছেলে-ছোকরা নয়নাকে নিয়েই কথা বলছিল। সুকোমলবাবু ওদের পাশ কাটিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়ি থেকে অতুলকে নিয়ে সকালেই থানায় চলে গেছিল সৌরভ। একটু বেলায় এসে খবর দিল— ''নয়নার এখনো কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ কোনও হদিশ করতে পারছে না। তবে ওদের অনুমান নয়না আর এপারে নেই। সম্ভবত কাঁটাতারের ওপার থেকে কেউ ওকে তুলে নিয়ে গেছে।''

খবরটা শুনে বুকে যেন শেল বিঁধল সুকোমলবাবুর। চেয়ারে যেমন বসে ছিলেন তেমনি নিশ্চলভাবে বসে রইলেন।

।। চার।।

এক বছর হয়ে গেল নয়না নিখোঁজ হওয়ার। পুলিশ প্রশাসন কেউ কিছু করতে পারেনি। গ্রামের লোকেরাও ধীরে ধীরে ঘটনাটি ভুলে যেতে শুরু করছে। শুধু হতভাগী অতুলের বউটা এখনো রোজ কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। কোনও কোনও দিন বর্ডারের কাছে গিয়ে কাঁটাতারের ওপারে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। সবাই বলে পাগলি হয়েছে অতুলের বউ। শিউলি গাছদুটিকে দেখলে নয়নার কথা মনে পড়ে সুকোমলবাবুর। গাছ দুটি যেন নয়নার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলে— 'নয়না নেই, নয়না নেই। ও হারিয়ে গেছে।'

অনেক রাতে একদিন সৌরভ সুকোমলবাবুর ঘরে এলো। ওর মুখটা কেমন অসহায় মনে হচ্ছিল। ধীর পায়ে বাবার পাশে এসে বসল, বলল— ''আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হবে না বাবা। গ্রামের পরিবেশ পালটে যাচ্ছে। দেবীর থানে পুজোও হচ্ছে না এবার। একে একে সব বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা এখানে কী নিয়ে থাকবো বাবা।''

কষ্টে সৌরভের গলা বুজে আসছে। একটু থেমে ধরা গলায় বলল— 'ঘরে যে নতুন অতিথি আসছে তার কথাও তো ভাবতে হবে।'

সুকোমলবাবুর দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এলো। ফুটে উঠলো ছোটবেলার সেই রাতের স্মৃতি। যে রাতে তারা দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুকোমলবাবুর বয়স তখন বারো বছর। রংপুরের বাড়িতে অনেক রাতে একটি মিটিং থেকে ফিরে ছোটকাকা বলল— 'অবস্থা ভালো না, আমরা ইন্ডিয়ায় চইলা যাই।'

সেই রাতেই তারা বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর এদেশে এসে আবার নতুন বাড়ি, আবার বাঁচার নতুন স্বপ্ন।

সুকোমলবাবু ছলছল চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'ছোটোবেলায় একদিন এভাবেই নিজের গ্রাম, নিজের বাড়ি সব ছেড়ে আমরা এদেশে এসেছিলাম। আজ আবার তুই আমায় কোন দেশে নিয়ে যেতে চাস?'

এরপর সৌরভ আর বেশিদিন সময় নেয়নি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব বিক্রিবাটা করে শহরে উঠে যাওয়ার পাকা বন্দোবস্ত করে ফেললো। সুকোমলবাবুও নিজের মনকে শক্ত করলেন দ্বিতীয়বার আপন ভিটে ছাড়ার জন্য।

যাওয়ার দিন ঠিক করাই ছিল। সৌরভ সেদিন একটি গাড়ি ভাড়া করেছে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভোর থেকে সব জিনিসপত্র গাড়িতে তোলা হচ্ছে। এতদিনের সকালে হাঁটার অভ্যাসটা সুকোমলবাবুর মজ্জায় লেগে গিয়েছিল। অনেকদিন পর তার ব্যতিক্রম হলো। আজ সকালে হাঁটতে বেরোনোর বদলে তিনি বাড়ির সকলের সঙ্গে চললেন নতুন এক ঠিকানায়। পুব আকাশে সূর্য উঠেছে। হর্ন বাজাতে বাজাতে গাড়িটি অতুলদের বাড়ির সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। অতুল তখন কচি আমডাল দিয়ে দাঁতন করছিল, দাঁতন করা থামিয়ে দিয়ে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শহরের দিকে ছুটে চলা সুকোমলবাবুদের সেই গাড়িটির দিকে। আর গাড়ি থেকে সুকোমলবাবু শুনতে পেলেন মেয়ের জন্য পাগলি হওয়া অতুলের বউয়ের সেই বুকফাটা কান্না। ■

যমালয়ে জীবন্ত মানুষ

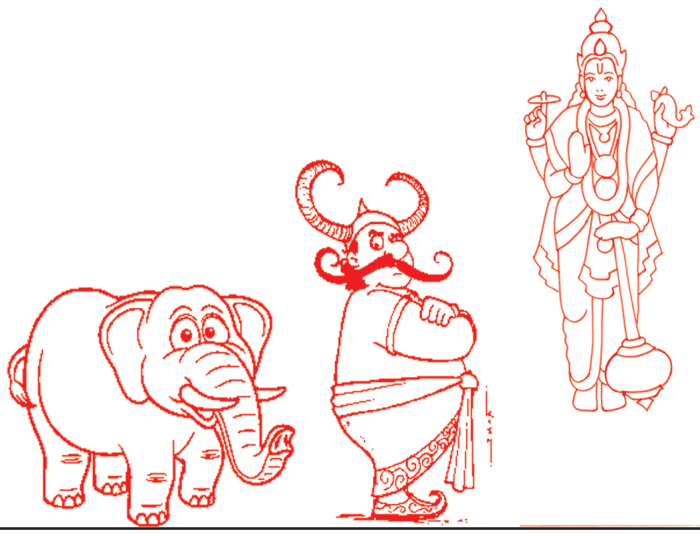

একটি হাতি মরার পর যমালয়ে এসেছে। যমরাজ তাকে বললেন, তোমাকে প্রকাণ্ড শরীর দিয়ে পাঠানো হলো আর তুমি সেখানে গিয়ে মানুষের বশ হয়ে গেলে কী করে? হাতি বলল— মহারাজ, মানুষ এমন একটা জাতি যে আমার চেয়েও বড়ো বড়ো প্রাণীকে বশ করে নিতে পারে। যমরাজ বললেন, আমার এখানে তো বহু মানুষ আসে। তাদের দেখে তো এরকম মনে হয় না। হাতি বলল, মহারাজ, তারা এখানে আসে মরার পর। যদি জীবন্ত মানুষ আসত তাহলে বুঝতে পারতেন। যমরাজ তাঁর এক দূতকে বললেন যমালয়ে একজন জীবন্ত মানুষ নিয়ে আসতে।

যমদূত মর্ত্যলোকে ঘুরতে ঘুরতে দেখল ,গরমে ছাদে একজন লোক খাটের ওপর ঘুমুচ্ছে। যমদূত খাটসমেত লোকটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যমালয়ের দিকে রওনা হলো। মাঝ পথে লোকটার ঘুম ভেঙে গেল। লোকটি বুদ্ধিমান ছিল। রকম সকম দেখে সে বুঝতে পারলো যমদূত তাকে যমালয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে তখন পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে কীসব লিখে কাগজটি পকেটে রেখে দিয়ে খাটের ওপর চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

খুব সকালে যমদূত যমালয়ে পৌঁছে গেল। যমরাজের সভা তখন সবে শুরু হয়েছে। লোকটি ঝট করে উঠেই পকেট থেকে কাগজটি বের করে যমরাজকে দেওয়ার জন্য যমদূতের হাতে দিল। তাতে লেখা ছিল, ‘ প্রিয় ধর্মরাজ, এই পত্রবাহক আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি। একে আপনার কাছে পাঠালাম। একে দিয়েই আপনি যাবতীয় কাজ করাবেন। ইতি— নারায়ণ, বৈকুণ্ঠধাম।’

লেখা পড়েই যমরাজ তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে লোকটিকে বললেন— আসুন মহারাজ, সিংহাসনে বসুন। কালবিলম্ব না করে লোকটি সিংহাসনে গিয়ে বসল। ততক্ষণে একজন যমদূত একটি লোককে সভায় হাজির করালো। নারায়ণের সেক্রেটারি লোকটি বলল , এ কে? যমদূত বলল— হুজুর, লোকটি ডাকাত। বহু লোক খুন করেছে। সেক্রেটারি বলল, বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দাও। সারাদিনে এরকম বহু পাপী, অধার্মিক, চোর, খুনি, বদমায়েশকে সেক্রেটারি বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দিল। যমরাজ আর কী করেন, বিষ্ণুর সেক্রেটারি যা করছেন তা মেনে নিতেই হবে।

ওদিকে নারায়ণ ভাবছেন একী কাণ্ড, এত লোক কোথা থেকে আসছে! পৃথিবীতে সবাই পুণ্যবান হয়ে গেল নাকি? নারায়ণ তখন স্বয়ং যমালয়ে হাজির হলেন। তাঁকে দেখেই সবাই উঠে দাঁড়ল। নারায়ণ যমরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি সবাইকে বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, সবাই ভালো মানুষ হয়ে গেল নাকি! যমরাজ বললেন— প্রভু, একাজ আমি করিনি। আপনি যাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন তিনি এসব করছেন। নারায়ণ বললেন, আমি তো কোনও লোক পাঠাইনি। লোকটি বলল, প্রভু, আপনার ইচ্ছা ছাড়া কি এখানে আসতে পারি? নারায়ণ বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি সবাইকে বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দিচ্ছ কেন? লোকটি বলল, অন্যায় হয়েছে। তবে গীতায় আপনার বাণী আছে, আপনার ধামে গেলে আর কেউ ফিরে আসে না। নারায়ণ বললেন, ঠিক কথা। কিন্তু তুমি একাজ কেন করলে? লোকটি বলল আমি ঠিক কাজই করেছি প্রভু। আমার কাছে যে আসবে তাকেই বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দেব, কাউকে দণ্ড দেব না। অল্প সময়ের জন্য সিংহাসন পেয়েছি তাই একটু ভালো কাজ করলাম।

নারায়ণ যমরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে যমালয়ে জীবন্ত মানুষ এল কী করে? যমরাজ তাঁর দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে জীবন্ত মানুষ নিয়ে এলে কেন? যমদূত বলল, আপনিই তো নিয়ে আসতে বলেছেন হুজুর।

হাতিটি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। সে যমরাজকে ববলল, প্রভু, আপনি আমাকে বলেছিলেন মানুষের বশ হলাম কী করে। এখন দেখছি আপনি ও নারায়ণ দু'জনেই মানুষের বশ হয়ে গেছেন। এই মানুষরা খুব সাংঘাতিক। এরা যদি মনে করে সবকিছু ওলট পালট করে দিতে পারে। কিন্তু কামনার বশবর্তী হয়ে এরা সংসারে ফেঁসে রয়েছে। নারায়ণ বললেন, যা হবার হয়ে গেছে, তুমি এবার আমার সঙ্গে চল। লোকটি বলল, প্রভু আমি একা যাব না। সবাইকে নিয়ে চলুন। নারায়ণ বললেন, সবাই চলো।

(সংগৃহীত)

ভারতের পথে পথে

চিল্কা হ্রদ

ওড়িশা রাজ্যের পুরী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে সবুজে ঘেরা পূর্বঘাট পাহাড়,পুবে বঙ্গোপসাগর, মাঝে বালির পাহাড়। চারপাশ ঘিরে শুধু জল আর জল, মাঝে মাঝে ছোটো বড়ো নানান দ্বীপ -- তারই নাম চিল্কা বা চিলিকা হ্রদ। পুরী ও গঞ্জাম জেলায় বঙ্গোপসাগরের অংশ ১১০০ বর্গকিলোমিটার ব্যাপ্ত মনমোহিনী এই চিল্কা হ্রদ। বর্ষাকালে এই হ্রদের জল লবণাক্ত থাকে না। তখন চিল্কাই এশিয়ার মিষ্টি জলের সবচেয়ে বড়ো হ্রদ। নভেম্বর থেকে মার্চ সাগরের নোনা জলে ভরপুর থাকে। হ্রদের মাঝে কালীযাই, কলিযুগেশ্বর, সাতপড়া, নলবন, গড়কৃষ্ণপ্রসাদ, পারাবার আরও কত দ্বীপ! দ্বীপগুলিতে জেলেদের বাস। কালীযাই দ্বীপে কালী, গঙ্গা ও যাইদেবীর মন্দির রয়েছে। মকর সংক্রান্তিতে দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থী ও পর্যটকরা আসেন। দ্বীপগুলিতে যাতায়াতের জন্য স্পিডবোট, মোটর বোট ও দেশি বোটের ব্যবস্থা রয়েছে।

জানো কি?

- ভারতের গির অরণ্যেই শুধু সিংহ দেখা যায়।
- হায়দরাবাদ শহর মুসি নদীর তীরে অবস্থিত।
- ওড়িশার মহানদীর ওপর হীরাকুঁদ বাঁধ তৈরি হয়েছে।
- শতদ্রু নদীর ওপর ভাকরা ও নাঙাল বাঁধ অবস্থিত।
- নাগপুরকে কমলালেবুর শহর বলা হয়।
- পাতাল রেল ভারতে প্রথম কলকাতায় চালু হয়।
- বিহারের পাটনার প্রাচীন নাম পাটলীপুত্র।

ভালো কথা

পরিবেশ দিবসে নিমগাছ লাগানো

ঋষির ঠাকুরদা বাড়িতে বীজতলা বানিয়ে অনেক নিমচারা তৈরি করে খুব যত্ন করতেন। আমরা ভাবতাম ঠাকুরদা ওগুলো কী করবেন। গত ৫জুন তিনি আমাদের স্কুলে এসে হেডস্যারকে কী যেন বললেন। হেডস্যার আমাদের বললেন, ছুটির পর ঋষিদের বাড়ি গিয়ে সবাইকে একটি করে নিমের চারা নিতে হবে আর নিজের নিজের বাড়িতে ভালো জায়গা দেখে লাগাতে হবে। স্যার বললেন, নিমগাছ খুবই উপকারী। সকালে দু'টি করে নিমের পাতা চিবিয়ে খেলে পেটে কৃমি হবে না, লিভার ভালো থাকবে, এককথায় শরীর ভালো থাকবে। তাছাড়া, নিমগাছের হাওয়ায় পরিবেশ শুদ্ধ থাকে। মায়ের কথামতো আমাদের বাড়ির পুবদিকে আমি গাছটিকে লাগিয়েছি। গাছটিকে আমি খুব যত্ন করি। ওর চারপাশে বেড়া দিয়েছি।

নিলয় কুমার, চতুর্থশ্রেণী, রাঙাডি, বলরামপুর, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ত ফ ন ল ব ভা	(১) রী নি ঙ্গ য় কা ম ভ
(২) ণ বি য় দ্বে রা প	(২) ন হ লে দ প রী কা

৪ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) তুষারমানব (২) দানখয়রাতি

৪ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) ধারাবিবরণী (২) নক্ষত্রমণ্ডলী

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। (২) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান (৩) অর্ঘ্যকমল সাঁই, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান। (৪) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ১৪

বিশ্বকাপ ওরা কী বলেন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বকাপ ফুটবল এমনই এক ইভেন্ট যা স্থান-কাল-পাত্র সাপেক্ষে সবস্তরের মানুষকে জীবনানন্দে 'ভাসিয়ে নিয়ে যায়।' এই অমোঘ সত্যবাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন বঙ্গীয় নবজাগরণের শেষ ঋত্বিক সত্যজিৎ রায়। তিনি নিজে আশৈশব দাবা অনুরাগী হয়েও বিশ্বকাপ ফুটবল এলে অধিকাংশ ম্যাচ রাত জেগে দেখতেন, তা পরদিন যদি শুটিং থাকত তাহলেও। আর তাঁর বিশাল ছত্রছায়ায় যাঁরা ঢাকা পড়ে গেছিলেন এমনই কয়েকজন চিরবন্দিত অ্যাথলিট, সাহিত্যিক, নাট্যকার কী চোখে দেখেন বিশ্বকাপকে, তা নিয়েই এবারের প্রতিবেদন।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক) :

যতই লেখালেখি নিয়ে থাকি না কেন, ফুটবল, হকি, টেনিস সব ধরনের খেলা দেখা আমার ফ্যাশন। ফুটবল বাঙালির প্রাণ আর ফুটবলের প্রাণ হলো বিশ্বকাপ। এই এক মাস ধরে চলা বিশ্বকাপ পুজোর লেখার চাপ সত্ত্বেও দেখব নিয়ম করে। 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' বলে কথা। সারা বিশ্বের মানুষের বিশেষ করে যুব প্রজন্মের প্রাণ চেতনাকে কাল চেতনার সঙ্গে মিশিয়ে দেয় এই বিশ্বকাপ। দুনিয়ার প্রাণস্পন্দন ঠিক কীভাবে অনুরণিত হচ্ছে তার প্রমাণ পেতে গেলে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখতেই হবে। আর এবারের বিশ্বকাপ তিন সর্বকালীন জিনিয়াসের বিদায় মঞ্চ হয়ে উঠবে। রোলান্ডো, মেসি, ইনিয়েস্তা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে যাবে জীবনের চেয়ে বড় কিছু করার জন্য।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
(নাট্য নির্দেশক, অভিনেতা) :

বিশ্বকাপ অবশ্যই দেখব। ছোটোবেলায় ফুটবলটা নিয়মিত খেলেছি। পরবর্তীতে নাট্যসংস্কৃতি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় খেলার পাট চুকে গেলেও নেশা ও উদ্দীপনাটুকু রয়ে গেছে। তাইতো গ্রুপের নাটক 'ফুটবল' অত নিষ্ঠা, প্রত্যয় সহকারে নামাতে পেরেছি এবং অনেকবছর একটানা চলেছে। বিশ্বকাপের সময়ে বাড়ির অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে এক স্পষ্ট বিভাজন হয়ে যায় আমার। আমি সব খেলাই প্রায় দেখি যদি

বাড়িতে থাকি। অন্যরা অন্য কিছু দেখে। তখন প্রায়ই ঝগড়া লাগে আর অবশ্যই আমার জিত হয়। এখন বিশ্বকাপ ফুটবল নিছকই এক খেলার মঞ্চ নয়, বিশাল শিল্প বাণিজ্যও জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। যে দেশে বিশ্বকাপ হয়, সেখানেও অর্থনীতি, সমাজনীতির আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একটাই স্বপ্ন দেখি— আমার প্রিয় জন্মভূমি একবার বিশ্বকাপে খেলবে আর আমি স্টেডিয়ামে বসে তেরঙার জন্য গলা ফাটাব।

গণেশ হালুই (চিত্রকর) :

ছবি আঁকার কাজে এতটাই ব্যস্ত থাকি যে খেলা দেখা হয় না। তাছাড়া আমি খুব একটা শারীরবৃত্তীয় ব্যাপারে আগ্রহবোধ করি না। দাবা, যোগাসনে যেরকম মেধা, মননের সর্বোচ্চ মাত্রার প্রয়োগ দেখা যায়, ফুটবলে তার প্রকাশ নেই। শিল্পীরা একটু অন্তর্মুখী এবং নান্দনিক উদ্ভাসের অনুসারী হন। সৃজন, নন্দনের প্রশান্ত আবেদন আছে এমন বিষয়ই পছন্দ আমার। তাই খেলার মাঠের দিগন্ত আমায় টানে না। তবে বিশ্ব পর্যায়ের দাবা খেলা হলে তার খোঁজখবর রাখি উৎসাহ নিয়ে।

প্রদীপ ব্যানার্জি
(ফুটবলার ও কোচ) :

এই অশীতিপর বয়সেও জবুথবু অবস্থায় এসেও বিশ্বকাপ ফুটবল আমায় পাগল করে দেয়। মেয়েরা রাত জেগে খেলা দেখতে বারণ করে, কিন্তু আমি মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে বিশ্বজুড়ে যে তুমুল উন্মাদনার সঞ্চার হয় তার আঁচে, অনুভূতির পরশে যৌবনের সেই মাদকতা ফিরে পাই। এখন আর সক্রিয় কোচিংয়েও নেই। মাঠের সঙ্গে যোগাযোগও ক্ষীণ। কিন্তু বিশ্বকাপ, ইউরো, কোপা আমেরিকা, চাম্পিয়নস লিগ সব দেখি। কারণ এই চলমান দুনিয়ার গতিময়তার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় বিশ্বকাপ ফুটবল বা অন্যসব বিশ্ব পর্যায়ের টুর্নামেন্টে।

আমার দুর্ভাগ্য, এশিয়া সেরা হয়েও বিশ্বকাপ খেলতে পারিনি। জাকার্তা এশিয়ান গেমসে সোনা জেতার সুবাদে তার পরের বিশ্বকাপের ভারত সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়েও যেতে পারেনি কর্মকর্তাদের দলাদলি ও সরকারের বৈমাতৃসুলভ চিন্তা ও আচরণের জন্য। তখন বিশ্ব হকিতে ভারতের একাধিপত্য, তাই হকি তারকারা ছিলেন দেশবাসীর নয়নের মণি।

ভারতের হকি নিয়ে তখন দেশের প্রশাসন, মাঠ-ময়দানের সংগঠক, সংবাদমাধ্যম, আপামর আমজনতা উদ্বেলিত হতো। ভারতীয় ফুটবল দল এশিয়া সেরা হয়ে যে পরিমাণ সম্মান, মর্যাদা পেয়েছিল দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, তার সিকিভাগও জোটেনি স্বদেশে ফিরে। তাই আমরা বিশ্বকাপ খেলব এটা নিয়ে কোনো উৎসাহ- উদ্দীপনার সঞ্চার হয় না জনমানসে। আমাদের দেশ তাই চিরকাল বিশ্বকাপে এক নম্বর দর্শক হয়েই থেকে গেল। জানি না জীবিত অবস্থায় ভারতকে বিশ্বকাপ খেলতে দেখব কিনা। এখন ভারতে ফুটবল নিয়ে যথেষ্ট উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু মান নেমে গেছে। আর বিশ্বকাপ খেলাও অনেক কঠিন হয়ে গেছে। ■

1977

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯

Regd. NGO NITI AAYOG, Govt. of India, New Delhi • Govt. Regd. W.B.

ফোন ঃ 9830597884, 9073402682, (033) 2463-7213

প্রতিষ্ঠাতা ঃ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

৩৯তম বর্ষের কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স ইন্ অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এণ্ড রাজযোগ

পাঠ্যসূচী ঃ ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ,অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এণ্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইণ্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজের (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারওপ্যাথি,রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাক্টিস, [স্ট্রেস(Stress) ম্যানেজমেন্ট], যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ্ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক জিম (পাওয়ার যোগা), যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বৎসর, প্রতি রবিবার ১ টা থেকে ৪ টে পর্যন্ত

যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ

আরম্ভ ঃ ২৪শে জুন ২০১৮

কোর্স ফি ঃ ৮০০০ টাকা, এককালীন ৬০০০ টাকা, ফর্ম ও প্রস্পেক্টাস ১০০ টাকা, ডাকযোগ ১২০ টাকা

ভর্তি চলছে

আমার দেখা কর্মবীর স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দ পোদ্দার

বিদ্রোহী কুমার সরকার

তাঁর মুখেই শোনা যে তিনি এম কম পাশ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিস্তারক হিসেবে প্রথমে আসেন মালদা জেলার আইহো গ্রামে। সফল বিস্তারক জীবন পার করে ১৯৬৪ সালে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে প্রচারক জীবন শুরু করেন। তিনি রাধাগোবিন্দ পোদ্দার। ১৯৭২ সালে তিনি বিভাগ প্রচারক রূপে মালদা আসেন। উত্তরবঙ্গে তিনি গোবিন্দদা নামেই পরিচিত।

আইহো গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বর্গের আগে প্রস্তুতি বৈঠকে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবককে দেখেছিলাম। তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। তাঁদের মধ্যে একজন অলক দাস। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তিনি এখনও গোবিন্দদার শেষ দায়িত্ব ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের কাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। যত কাছে থেকে তাঁকে দেখেছি ততই অবাক হয়ে গিয়েছি। সঙ্ঘগত প্রাণ-- যেন ডাক্তারজীর প্রতিমূর্তি। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন। শিশুসুলভ ব্যবহার। তাঁর কত না ঘটনা! কখনও তেল ভেবে মোবিল মেখে নেওয়া, ছাতু ভেবে তৎকালীন অসুস্থ নগর প্রচারকের এক বোতল হরলিক্স খেয়ে নেওয়া ইত্যাদি। ভোজন রসিক ছিলেন। তারজন্য কোনও কোনও সময় তাঁকে কষ্টে পড়তে হয়েছে। যেমন, মালদার অক্রুরমণি হাই স্কুলে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ চলছে। সমারোপের দিন কলিগ্রাম থেকে স্বয়ংসেবকরা নিয়ে এসেছে খাঁটি ক্ষীর। সকলকে দেওয়ার পরও বেশ কিছুটা থেকে যায়। তার সবটাই খেয়ে নেন গোবিন্দদা। ভুগতেও হলো দু' দিন। কোনও একসময় ডাক্তার ফল খেতে বলেছেন, তারজন্য একটা আস্ত কাঁঠাল খেয়ে নেওয়া। আবার দীর্ঘ সময় না খেয়েও তাঁকে আমরা হাসিমুখে দেখেছি।

উর্ধ্বতন কার্যকর্তা যেমন অমলদা (স্বর্গীয় অধ্যাপক অমল কুমার বসু), কেশবজী (প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত), বংশীদা (স্বর্গীয় বংশীলাল সোনী) বা মাস্টারমশাই (স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী) ভ্রমণে এলে তাঁদের যেন কোনও অসুবিধা না হয় তারজন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। ১৯৭৩ সালে ছত্রপতি শিবাজী রাজ্যাভিষেক ত্রিশতাব্দী সমারোহ সমিতির কার্যক্রম উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই মালদা বিভাগে আসেন। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে প্রদর্শনীর চিত্র নিয়ে আমার ও বিকাশ ঘোষের ঘোরার সুযোগ হয়। তখনও দিনাজপুরে শাখার বিস্তার তেমন হয়নি। কিন্তু গোবিন্দদার প্রচণ্ড পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার কারণে রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটে বর্ণাঢ্য কার্যক্রম হয়। দু'জায়গাতেই বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, অধ্যাপক ও বিদ্বজ্জনের সঙ্গে সম্পর্ক হয়।

গোবিন্দদার শারীরিক দক্ষতা ও কার্যক্রম রচনার কারণে হতাশ মানুষের মনেও উৎসাহের সঞ্চার হতো। অনেকে তাঁকে উৎসাহ প্রমুখ বলতেন। তাতে আমার আপত্তি ছিল। আমার মতে তিনি ছিলেন উৎসাহের মূর্ত প্রতীক। তাঁর কাজ করার প্রবণতা দেখে কত না

স্বয়ংসেবক প্রেরণা পেয়েছে। যার ফলস্বরূপ মালদা বিভাগে শাখার সংখ্যা একসময় ৩০০ ছাড়িয়ে যায়। তাঁর সান্নিধ্যে থাকলে মনের মধ্যে নিরাশ, হতাশা কু-আশা কোনও কিছুই আসার রাস্তা খুঁজে পেত না।

১৯৭৪ সালে শিলিগুড়িতে ১ম ও ২য় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ একসঙ্গে চলছে। গোবিন্দদা মুখ্য শিক্ষক। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় বর্গ সুন্দরভাবে চলছে। সেই সময় কত না মজার ঘটনা ঘটেছে যা এখনও আমার মনে দাগ কেটে রয়েছে। খাবার কম পড়েছে —গান গেয়ে কিছু সময় বের করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

১৯৭৫-এ জারি হয় জরুরি অবস্থা। আমরা শাখা বন্ধ রেখে কখনও ভলিবল, কখনও কবাডি খেলার নাম করে, কখনও নদীর ধারে বসে গল্প করার অছিলায় বৈঠক করেছি নির্দেশ অনুসারে। কিন্তু কে কোথায় আছে সে খবর গোবিন্দদার কাছে থাকত। ফুলপ্যান্টে জামা গুজে, বেল্ট লাগিয়ে, চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে হঠাৎ আমাদের মধ্যে বসে পড়তে দেখে অবাক হয়ে যেতাম--- আরে , ইনি তো গোবিন্দদা! সে সময় কালীশঙ্কর চক্রবর্তী জেলা প্রচারক— সাধু প্রকৃতির মানুষ, তিনিও আমাদের এভাবেই সঙ্গ দিয়েছেন। সময় এল সত্যাগ্রহের। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন সময়ে সত্যাগ্রহ হলো। মালদায় আমরা ৮৫জন জেলে গেলাম। জানি না কবে ছাড়া পাওয়া যাবে। কারণ নির্দেশই ছিল কেউ যেন মুচলেকা না দেয়। এই পরিস্থিতিতে এতজন কারাবরণ করল— প্রেরণা গোবিন্দদা ও কালীশঙ্করদা।

প্রথম দফায় আমাদের ১২জনকে মিশা দিয়ে বহরমপুর জেলে পাঠানো হলো। যেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো সেখানে আগে থেকেই ৬জন নকশালকে রাখা হয়েছিল। তারমধ্যে একজন ছিলেন বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক দীপঙ্কর চক্রবর্তী। আড়াই মাস পরে গোবিন্দদাকে মিশা দিয়ে বহরমপুর জেলে পাঠানো হলো। জেলের মধ্যে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল জেলের মধ্যে শাখা, ফুলের বাগান করা, রাস্তা তৈরি করা এবং বিভিন্ন উৎসব পালন করা।

জেলের নিয়ম অনুসারে সন্ধ্যায় গুনতি হওয়ার পর সকলকে ঘরে আটকে রেখে তালা বন্ধ করে দেওয়া হতো। কিন্তু গোবিন্দদার কথায় জেলার সাহেব ও সুপারিন্টেনডেন্ট আমাদের কার্যক্রমে আসতে রাজি হয়েছিলেন। কার্যক্রম তো রাতে, তখন তো তালা বন্ধ। তাঁরা সুযোগ পেলেন, বললেন যাওয়া যাবে না। শেষে স্বয়ংসেবকদের ব্যবহার দেখে ও গোবিন্দদার কথায় তাঁরা রাজি হলেন। তালা খোলা হলো। জেলার ও সুপার সাহেব আমাদের ব্যারাকে এলেন। বাইরে থেকে তালা বন্ধ হয়ে গেল। পুরো দেড় ঘণ্ট তাঁরা আমাদের কার্যক্রমে থাকলেন, শুধুমাত্র গোবিন্দদাকে বিশ্বাস করেছিলেন বলে।

জরুরি অবস্থা উঠে গেল নির্বাচনের পর। ইন্দিরা সরকারের পতন হয়ে জনতা সরকার ক্ষমতায় এল। আমরা ছাড়া পেলাম। মালদায় আমাদের জোরদার সংবর্ধনা দেওয়া হলো। গোবিন্দদা সে সময় কলকাতায় চলে গেলেন। তাঁর ভাগ্যে সেটা হলো না। তিনি তো সংবর্ধনা পাওয়ার আশায় জেলে যাননি। আমাদের মধ্যে হয়তো বিন্দু মাত্রও সে ভাব ছিল।

কলকাতা থেকে তিনি ফিরে এসে আবার সঙ্ঘকাজে ডুবে গেলেন। তাঁর মূল কাজ হলো শাখা বিস্তার। বন্ধ হয়ে যাবে যাক, আগে বিস্তার তো হোক। বীজ ফেললেন তিনি। এখন ফল পেতে শুরু করেছি আমরা।

তারপর তাঁকে দায়িত্ব দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো দক্ষিণবঙ্গে (তখনও প্রান্ত ভাগ হয়নি) অর্থাৎ গঙ্গার ওপারে। চব্বিশ পরগনা বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব পালন করলেন। তারপর প্রদেশের সেবা বিভাগের দায়িত্ব এল। তারপর আবার গঙ্গার এপারে— তাঁর মনের জায়গায়। শরীরে বয়সের ছাপ দেখা গেল— কিন্তু সেটা বাইরে; মনে কোনও চাপ দেখা গেল না।

নিরলস ভাবে কাজ করে চললেন (কোনও সময় শরীর সঙ্গ না দিলেও)। নিরাশার পরিবেশ যাতে তৈরি না হয় সেজন্য তিনি অনেক সময় সংখ্যা বাড়িয়ে বলতেন। সেটা এই শেষের দিকে। মনে খুব দুঃখ পেয়েছি যখন কোনও কার্যকর্তা বা প্রচারক (যারা শেষের দিকের গোবিন্দদাকে জানেন, আগের গোবিন্দদাকে জানেন না) তাঁর কথা শুনলেই হেসে উঠতেন বা বাস্তবসম্মত নয় বলে উপহাস করতেন। কিন্তু গোবিন্দদা জানতেন 'সঙ্কল্প মেঁ সিদ্ধি'। উত্তরবঙ্গে সঙ্কল্প শিবির হলো জেলায় জেলায়, তাঁর ছোট্ট কথায় প্রেরণা পেয়েছি আমি। চেষ্টা চালানো হলো— একটা প্রভাত শাখা থেকে ১১৬জন শিবিরে উপস্থিত হয়েছিল। অসুস্থ শরীরে এত আনন্দ পেয়েছিলেন যে তিনি লিখলেন--- এটা মাইল স্টোন।

অসুস্থতার কারণে তাঁর শাখায় যাওয়া বন্ধ হলো। তিনি মালদা কার্যালয়েই শাখা শুরু করলেন। সংখ্যা কম বা বেশি তাতে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যেত না। তিনি কখনও কাউকে দোষারোপ করেননি। নিজেই ফোন করে সবাইকে ডাকতেন। যদিও এই শাখাকে নগর শাখার মধ্যে ধরাই হতো না। এটা তিনি জানতেন না, জানলে দুঃখ পেতেন। শুধু সঙ্ঘ নয়, সঙ্ঘের বিবিধ ক্ষেত্রের কার্যকর্তাদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। সবার সুবিধা অসুবিধায় সঙ্গে থাকার চেষ্টা করতেন।

সেই গোবিন্দদা গত ৫জুন লোকান্তরিত হলেন। রেখে গেলেন অনেক কিছু যা অনুসরণযোগ্য। কাজের মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন, তাঁর 'কাস্টিং শ্যাডো' নিশ্চয়ই দিনে দিনে বাড়বে।

(লেখক উত্তরবঙ্গের পূর্বতন প্রান্ত সঙ্ঘচালক)

মাকুর মতো সেকুও গালাগালি

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আমাদের জাতীয় সংগীত কি সত্যিই বিদেশি শাসকের প্রশস্তিগাথা? তর্কটি মাঝে মাঝেই চাগিয়ে ওঠে পত্রপত্রিকায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় বান ডাকে যুক্তি-কুযুক্তি ও আবেগের। রবি ঠাকুর আবেগপ্রবণ হলেও বুদ্ধিমান কবি মানুষ। যাঁর মন অন্তরে অন্তরে উনপঞ্চাশ বায়ুসন্তরে, তাঁর কবিতা লজিকের হিসেবে মেলানো কঠিন, আর পারিপার্শ্বিক সবসময়েই হয়তো প্রতিকূল সাক্ষ্য দেয়— মেনে নিয়ে তিনি তো আগেই সাফাই গেয়ে রেখেছেন— চিরকালের, চিরদিনের যিনি রাজা, যিনি অধিনায়ক।

তো, বেশ। বাস্তব ও সরস গল্প মেশানো এমন নানান সাফাই-ই তো ঘোরে রবীন্দ্রজব্দ সভ্যতায়, রসিকজনের মনে মনে, মুখে মুখে। শান্তিনিকেতনে নাকি চোর এসেছিল, কিন্তু কিছুই নিতে পারেনি— তাই তো কবি লিখিয়াছেন, 'এসেছিলে তবু আসো নাই-ই, জানায়ে গেলে।' ভৃত্য বনমালীকে নিয়ে নাকি লেখা হয়েছিল, হে মাধবী, দ্বিধা কেন— ঘরে ঢুকতে তার দ্বিধা দেখে। দ্বিধাহীনভাবে অবশ্য কোনও কোনও রসিক পাষণ্ড হেমা মালিনীর মতন কোনও ধোবি, মানে নেতি নেতি করে ধোপানি, বা রামী-চণ্ডীদাসের গল্পও যখন আমাদের মাথায় থাকে, তখন কত কী-ই তো রোমান্টিক আবেশে লিখে দিতে পারেন! গল্পের গোরু গাছে উঠলে দর্শক-পাঠক-চিন্তক, সব্বারই মনে বোধহয় ঊনপঞ্চাশ বায়ু দোলা দিয়ে যায়। হ্যাঁ, রাজ্যাভিষেক সংগীত নিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের দুর্দান্ত সরস রচনাও মনে পড়ছে। যাই হোক, জেনুইন রাজপ্রশাস্তি অবশ্য লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রাজপথে প্রশস্তি শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে সেই গান গেয়েও ছিলেন।

যাই হোক, প্রসঙ্গান্তরে কেন যাই! হ্যাঁ, রবিঠাকুরের সঙ্গে ডি এল রায়ের তো কতদিকেই কত টক্কর। কবি রবি বিলেত গেলেন ব্যারিস্টারি পড়তে, সিভিল সার্ভিসেও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দ্বারা 'কিছুই তো হলো না।' ওদিকে দ্বিজু রায়ের বিলেতযাত্রা পৈতৃক অর্থে, দেওয়ান-পুত্র হিসেবে তিনিও কম সম্পন্ন নন— তারওপর, শেষমেষ একজন রাজকর্মচারী তো বটে! হ্যাঁ, এসব নিয়েও কত লেখাজোখা হয়েছে, এও তো দেখার ভঙ্গি একরকম। রবীন্দ্র বিদূষণই বলি আমরা, দ্বিজেন্দ্র বিদূষণ তো নয়— বেচারি দ্বিজু রায় ততটা পরমায়ুও পাননি যে ফসলের পরিমাণে পাল্লা দেবেন। রবিঠাকুর, একটি পরিচয়ে প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতি তো অবশ্যই। সেই সময়ের দেশ-কাল-পরিস্থিতি, রবীন্দ্রনাথের সামাজিক অবস্থান, শ্রেণীচরিত্রের নির্মোহ বিশ্লেষণ তো অনেক শতাব্দীর মনীষার কাজ। কিন্তু, রাজপ্রশস্তি রচনা, সেই সময়ের প্রেক্ষিতে, খুব কি দোষাবহ ব্যাপার?

শতবর্ষের দূরত্ব এসেও সিমপ্যাথির দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে দেখি না আমরা। বন্ধুর মতন চোখ রাখি না চোখে। গুরুদেব-গুরুদেব চেহারাটি কতখানি যে আড়াল করেছে তাঁর ব্যক্তিত্ব— সে কৌতুক যে বড় ব্যথায় তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন কত না কত লেখাতে! সুতরাং, যা হবার, তাই হচ্ছে। কেচ্ছাকাহিনি বাজারে দেদার বিকোচ্ছে, আর আগমার্কা পণ্ডিতরা দাঁত কিড়মিড় করছেন— দাড়িবুড়োর থেকে কেন দৌড়ে পালাচ্ছে নবীন প্রজন্ম, অথবা কেন এত এত প্যারডিযোগ্য তাঁর গান, সে নিয়ে কি হিংসেও আছে কারও কারও?

আজকের দিনেও রবীন্দ্র বিদূষণ— জ্ঞানীগুণী পরিচিতজনদের ফেসবুকীয় কথাবার্তায় এই অভাজন যোগ দেয় মাঝে মাঝে। বাংলা বা সংস্কৃতের অধ্যাপক নন, জাতীয় সংগীত যে আদতে রাজপ্রশস্তি, একথা বলতেই, ইংরেজির এক অধ্যাপক প্রকাশ্যে লিখে ছিলেন, হিন্দুত্ববাদীরা অমন বলে।

হিন্দুত্ববাদী? সেটা কী? ইদানীং বেশ হাওয়া উঠেছে, যেন গালাগালিযোগ্য বস্তু একরকম। কিন্তু, এটা খায়, না মাথায় দেয়? কমলাকান্তর মতন শুধাতে ইচ্ছে করে, হিন্দু কি একটা জাতি? কেউ বলি বাঙালি, কেউ বলি ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য— এমন কত কী। আমার মনে পড়ে যায় ভেদাভেদহীন ছাত্রবেলার কথা। অধ্যাপক যে আমারই কলেজি দাদা। এই উদার কলকাত্তায়ী আবহেই আমার মতন বেড়ে ওঠা। যা কিছু অন্যরকম ভাবনা, বৈপরীত্যময়, আউট অব দ্য বক্সও বলা যায়, তাই-ই গালাগালিযোগ্য? মানে, তুমি হিন্দু, এটা একরকম গালি?

নকশালি আমলে নেহাতই বালক ছিলাম আমরা। তবু, রিফ্লেকটেড গ্লোরিতে, কলেজস্ট্রিট চত্বরে লেখাপড়া করতে এসে, সেই আদর্শবাদী উত্তেজনার আঁচ পুইয়েছি আমরাও। ব্যক্তিহত্যা ও ধান্দামূলক অন্ধকার কালপর্ব পেরিয়ে, গত শতাব্দীর আটের দশকে, নকশাল শুধুই একটি ব্যর্থ স্বপ্নের রোমান্স। সিদ্ধার্থের হাতে একটি প্রজন্ম পিটিয়ে শেষ, পালিয়ে বেঁচে বিদেশকেই করল উপনিবেশ মেধাবী ছেলেপুলেরা। পড়ে থাকল শুধু গোরু-ছাগলেরা— এমনই তো জনশ্রুতি। তবে, এই সময়ের নেতৃত্বহীনতা, দিশাহীন শূন্যতার কথা যারা বলেন, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই।

দাড়িওলা পঞ্চম জর্জকে বা কোনও পুরুষ রাজপুত্রকে কেউ 'স্নেহময়ী তুমি মাতা' বলবে কিনা কবিতায়, সে তর্কে যারা মাতে, ও একটু ভিন্ন কথা বললেই 'হিন্দু' বলে গালি দেয়— তারা যে গোমাতারই সন্তান, সে বিষয়ে আমার বিশ্বাস ধীরে ধীরে জাগছে। বরং হিন্দু হওয়া ভালো। ভালো একটু অন্যরকম চিন্তাভাবনা। দক্ষিণ দুয়ার থেকে দখিনা বাতাস আসুক। চিকেন পক্স, ওসব ওষুধ বেরিয়ে গেছে বহু আগেই।

সেই উত্তাল দশক সত্তরের 'মাকু' গালাগালির মতন যে 'সেকু' ও একরকম গালাগালি বলে জানি। 'হিন্দু' ব্যাপারটা এর বাইরে, অনেক মানুষ জড়িয়ে উজ্জ্বল একরকম আদর্শ তাই না? ▮

ভারতের নাগরিকত্ব আদায়ের পথে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে সাময়িক স্বস্তি। দেশভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা কয়েক হাজার উদ্বাস্তুর অবশেষে ভারতের নাগরিকত্বের ন্যূনতম সুবিধা মিলল। ১৯৪৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তিন লক্ষেরও বেশি পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্বাস্তু ভারতে চলে আসেন এবং এদের বেশিরভাগ জম্মু-কাশ্মীর অঞ্চলে বাস করতে থাকেন। কিন্তু তারপর সত্তর বছর কেটে গেলেও তাঁরা ওই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দার স্বীকৃতি পাননি, এমনকী ভারতের নাগরিকত্ব থেকেও তাঁরা এতদিন বঞ্চিত ছিলেন। এই প্রথম কোনও ভারত সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করেছে। গত ৮ জুন জম্মু-কাশ্মীরে দু' দিনের সফর শেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ঘোষণা করেন এই উদ্বাস্তুদের পরিবার পিছু দৈনিক একুশ টাকা করে ক্ষতিপূরণের হিসাবে সত্তর বছরের নিরিখে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। মোট পাঁচ হাজার সাতশো

চৌষট্টিটি পরিবার আপাতত এই সুবিধা পাবে।

পশ্চিম পাকিস্তান উদ্বাস্তু অ্যাকশন কমিটির সভাপতি লভরাম গান্ধী যদিও জানিয়েছেন সরকারের খাতায় এধরনের নথিভুক্ত উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা ১৯ হাজার ৯৬০টি হলেও, ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে মাত্র ৫ হাজার ৭৬৪টি পরিবার। তিনি আরও বলেছেন, প্রায় তিন প্রজন্ম ধরে সত্তর বছর যাবৎ যে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছেন উদ্বাস্তুরা, সেই তুলনায় এই ক্ষতিপূরণ উপযুক্ত নয়। যদিও একই সঙ্গে তিনি কেন্দ্রের মোদী সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, এই প্রথম কোনও কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের কথা চিন্তা করল আন্তরিকতার সঙ্গে তাতে ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী হওয়া যায়।

রাজ্য সরকারি সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ১৯ হাজার ৯৬০টি পরিবারের মধ্যে ৫ হাজার ৭৬৪টি পরিবার তাদের ভারতবর্ষের নাগরিকত্বের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করতে পারায় কেবল তাদেরকেই ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য সুবিধার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এক আধিকারিক জানিয়েছেন বাকি পরিবারগুলিও যাতে নাগরিকত্বের সুবিধা অর্জন করতে পারে, তার উপযুক্ত শর্তাদি পূরণে সবরকম ব্যবস্থা করা হবে। পশ্চিম পাকিস্তান উদ্বাস্তু অ্যাকশন কমিটির সহসভাপতি সুখদেব সিংহ পাশাপাশি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন শুধু ক্ষতিপূরণেই সমস্যা মিটবে না, উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্রও দিতে হবে। কারণ এই শংসাপত্র না থাকলে সরকারি চাকরি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা জমি কেনার অধিকারও থাকে না।

উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের কথোপকথনে প্রকাশ্যে এসেছে যে কতটা ভায়ানক ও কী অবর্ণনীয় পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে তাদের। ন্যূনতম মানবিক দৃষ্টিতে বিষয়টি দেখার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান উদ্বাস্তু অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, বিগত সত্তর বছর ধরে এঁদের প্রতি যে অবিচার হয়েছে, একদিনে তার সুবিচার সম্ভব নয়। তবে কেন্দ্রের সাড়ে পাঁচ লক্ষের অনুদান এনিয়ে একটি বিরাট পদক্ষেপ ও তাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি আদায়ের প্রথম ধাপ বলে তাঁরা মনে করেন।

ইউনিসেফের রিপোর্ট : ভারতে প্রসূতি মৃত্যুর হার কমছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ শংসাপত্র দিয়েছে খোদ ইউনিসেফ। তাদের পর্যবেক্ষণ, ২০১৩ সালের তুলনায় ভারতে প্রসূতি মৃত্যুর হার ২২ শতাংশ কমেছে। ইউনিসেফের প্রতিনিধি (ভারতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত) ইয়াসমিন আলি হক সম্প্রতি বলেছেন, গত চার বছরে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মায়েদের অকালমৃত্যু রোধে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০১১-১৩ সালে প্রতি ১ লক্ষ শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে ১৬৭ জন মায়ের মৃত্যু হতো। এখন তা কমে হয়েছে ১৩০। ইয়াসমিন আলি হক বলেন, 'উত্তরপ্রদেশে বাড়িতে সন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রবণতা সব থেকে বেশি। স্বাভাবিক ভাবেই উত্তরপ্রদেশে প্রসূতি মৃত্যুর হার ছিল সব থেকে বেশি। আমাদের তথ্য বলছে, ওই রাজ্যে প্রসূতি মৃত্যুর হার কমেছে ৩০ শতাংশ, যা ভারতের সামগ্রিক (২২ শতাংশ) হ্রাসের থেকেও বেশি।' ইউনিসেফের বিশেষজ্ঞরা ৬২, ৯৬, ১০১ জন প্রসূতির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। সন্তানের জন্ম দেবার সময় তাদের মধ্যে মাত্র ৫৫৬ জন মারা যান। এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে মোদী সরকারের নেওয়া ব্যবস্থাগুলির কথা। সরকারি সূত্র থেকে জানা গেছে দেশের ১ কোটি ১৬ লক্ষ প্রসূতির প্রাক-প্রসব পরীক্ষা করা হয়েছে। ৮০ লক্ষেরও বেশি গর্ভবতী মহিলাকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ৫০ লক্ষ গর্ভবতী মহিলাকে উৎসাহ ভাতা দিয়ে উৎসাহ জুগিয়েছে কেন্দ্র।

চীনের প্রকল্পে মোদীর না

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি চীনের কিংদাও শহরে অনুষ্ঠিত সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের বৈঠকে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পে ভারতের অমতের কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন। চীনের এই প্রকল্পে ভারতের যে কোনও সম্মতি নেই এবং এই প্রকল্পে ভারত যে অংশগ্রহণ করতে চায় না— তা আগেও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে গত এপ্রিল মাসে সাংহাই

কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের পর প্রকাশিত বিবৃতিতেও বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পে সমর্থনকারী দেশগুলির ভিতর ভারতের নাম ছিল না। ভারত গোড়া থেকেই বলে এসেছে, এই প্রকল্পটি ভারতের সার্বভৌমত্বকে আঘাত করবে।

সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের বৈঠকে এই প্রথমবার ভারত যোগ দিল। কিন্তু প্রথমবারের বৈঠকেই ভারত চীন ও পাকিস্তানের মনোভাবের কড়া সমালোচনা করে। সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে সবরকম সদর্থক পদক্ষেপই অভিনন্দযোগ্য। কিন্তু বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পটিকে ভারত একেবারেই সমর্থন করতে পারছে না। এই প্রকল্পের অংশীদারও ভারত হবে না। কারণ, ভারত মনে করে এই প্রকল্পটি তার সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের প্রসঙ্গটিও তুলে ধরেন। বলেন, এই প্রকল্পে ভারতের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে পাকিস্তান সম্পর্কেও কড়া মনোভাব প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। সরাসরি পাকিস্তানের নাম না করলেও দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের দিকেই ইঙ্গিত করেন তিনি। বলেন, আফগানিস্তানে যারা শান্তি নষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ করতে হবে। পরে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে ১৭ পাতার একটি যৌথ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পে ভারত ছাড়া রাশিয়া, পাকিস্তান, কাজাকস্তান, উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তানের সম্মতি রয়েছে। ২০১৩ সালে চীনা রাষ্ট্রপ্রধান জি জিনপিং বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পের প্রস্তাব দেন। প্রাচীন বাণিজ্য পথকে অনুসরণ করে এশিয়া, ইউরোপ এবং অফ্রিকার কয়েকটি দেশের ভিতর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়। কিন্তু চীন মুখে যাই বলুক, এর পিছনে চীনের যে একটি প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে তা ভারত প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছে।

জম্মু-কাশ্মীরের গ্রামে গ্রামে জিহাদের রমরমা, কোতলের ট্রেনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দু'হাজার দশের গ্রীষ্মের পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রামগুলিতে জিহাদের রমরমা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সেই সময় মোট ৩৫৪টি গ্রামের ৪৬৭ জন যুবক জঙ্গি হয়ে ওঠে। নিরাপত্তা এজেন্সির দেওয়া খবরে এই তথ্য মিলেছে। তালিকার শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলা। ২০১০-এর পর এখানকার ৭০টি গ্রাম থেকে ৯৫ জন যুবক সন্ত্রাসবাদী হয়েছে। হেফ জৈনপুরা থেকে সাতজন এবং পহলিপোরা, কেলার জৈনপোরা ও প্যাডেরপোরা থেকে চারজন যুবক অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। পুলওয়ানা জেলায় ৬০টি গ্রামের ৮৮ জন জঙ্গি হয়েছে। গুন্দবাগ গ্রাম থেকে হয়েছে ৩ জন। কুলগাম জেলার ৪৯টি গ্রামের ৬৪ জন জঙ্গি হয়েছে। রেডওয়ানা বালা থেকে ৭ জন, হাউড়া থেকে ৫ জন, ইয়ামরাচ থেকে ৩ জন হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। অবন্তীপুরা জেলার ৪১টি গ্রামের ৫৪ জন জঙ্গি হয়েছে। অনন্তনাগ জেলার ২৭টি গ্রাম থেকে হয়েছে ৩৪ জন। উত্তর কাশ্মীরের ছবিটাও একই রকম। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জেলার পরিস্থিতি এরকম : বারামুল্লার ২৮টি গ্রামের ৩৩ জন জঙ্গি হয়েছে। বান্দিপুরের ১৩টি গ্রামের ১৭ জন, সোপোরের ১৮টি গ্রামের ২৯ জন, কুপওয়ারার পাঁচটি গ্রাম থেকে একজন করে এবং হান্দওয়ারার ৪টি গ্রাম থেকে একজন করে যুবক জিহাদি ট্রেনিং নিয়ে পুরোদস্তুর জঙ্গি হয়ে গেছে। নিরাপত্তা এজেন্সির রিপোর্ট অনুযায়ী মধ্য কাশ্মীরের বুদগাম ও শ্রীনগরের ২০টি গ্রামের ২২ জন জঙ্গি হয়ে গেছে। চেনার উপত্যকার ১৯টি গ্রাম থেকে হয়েছে ২২ জন। একটা জিনিস স্পষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলো কাশ্মীরের প্রায় প্রতিটি গ্রাম থেকেই যুবকদের নানাভাবে প্রলুব্ধ করে জিহাদি বানাচ্ছে। জন্নতের লোভে গরিব এবং অশিক্ষিত মুসলমানের মনে জিহাদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ আছে। তাকেই ব্যবহার করছে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা।

সরকারি পয়সায় লাগানো মার্বেল, এ সি খুলে নিয়ে বাংলো ছাড়লেন অখিলেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মুখ্যমন্ত্রিত্ব যাওয়ার পরও কিছুটা জোর করেই সরকারি বাংলো দখল করে রেখেছিলেন সমাজবাদী পার্টি নেতা অখিলেশ যাদব। অবশেষে সরকারি চাপের মুখে পড়ে যখন বাংলো ছাড়লেন অখিলেশ যাদব, তখন দেখা গেল, সরকারি টাকায় সাজানো মুখ্যমন্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট এই বাংলো থেকে বহু জিনিস তিনি খুলে নিয়ে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাংলোটির অনেক ক্ষতিসাধনও করে গিয়েছেন। সম্প্রতি রাজ্যের প্রাক্তন ছয় মুখ্যমন্ত্রীকে সরকারি বাংলো ছাড়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এই ছ'জন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভিতর রাজনাথ সিংহ, মুলায়ম সিংহ যাদব, মায়াবতীরও নাম রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ীই রাজ্য সরকার ২ জুনের ভিতর বাংলো ছাড়ার সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেন। সরকারি নির্দেশ পাওয়ার পর রাজনাথ, মুলায়ম, মায়াবতী নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তাঁদের সরকারি বাংলো খালি করে দেন। এমনকী সরকারি খরচে বাংলোয় বসানো কোনো জিনিসপত্রও তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে যাননি। সরকারি নির্দেশ পাওয়ার পরও অখিলেশ যাদব অবশ্য তাঁর এই সরকারি বাংলোটি ছাড়তে টালবাহানা করছিলেন।

অখিলেশ যাদব উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসার পর, তার জন্য এই বাংলোটি বরাদ্দ হয়েছিল। বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ করে এই বাংলোটিকে সাজিয়ে তোলা হয়। দামি পাথর, দাবি আসবাবপত্রে সজ্জিত এই বাংলোটির দখলদারি মুখ্যমন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার পরও ছাড়ছিলেন না অখিলেশ। অবশেষে অনেক টালবাহানার পর গত ৮ জুন তিনি বাংলোটি ছাড়েন। বাংলোর চাবি রাজ্যের আবাসন দপ্তরের কাছে পাঠিয়ে দেন অখিলেশ যাদব।

পরদিন আবাসন দপ্তরের কর্তারা বাংলোয় গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। চাবি খুলে বাংলোর ভিতর প্রবেশ করে তাঁরা দেখেন, বাংলোটির একেবারেই লণ্ডভণ্ড অবস্থা। সরকারি খরচে লাগানো বাংলোর সব দামি টাইলস খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সব শীতাতপ মেশিন। সরকারি খরচে যেসব দামি আলো লাগানো হয়েছিল— তাও নেই। শৌচাগার, রান্নাঘরে যেসব সৌখিন, দামি জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো হয়েছিল— সবই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমনকী বাগান থেকে বাহারি দামি গাছও তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক কথায়, বাড়ির ভিতরে একটি তাণ্ডবলীলা চালানো হয়েছে। এ দৃশ্য দেখার পরই আবাসন দপ্তরের কর্তারা উচ্চতম মহলে বিষয়টি জানান। সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদমাধ্যমকে ডেকে দেখানো হয় বাংলোর অবস্থা। পরে সংবাদমাধ্যমে এই সংবাদ বিশদভাবে প্রকাশ হলে হইচই পড়ে যায়।

এই ঘটনার পর ইউপি সরকারের আবাসন দপ্তরের আধিকারিক যোগেশ কুমার শুক্লা জানিয়েছেন, এই ঘটনার যথার্থ তদন্ত হবে। এভাবে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন কারা করল, কেনই বা করল— তা খতিয়ে দেখা হবে। দোষী প্রমাণিত হলে, যথাযথ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। ইউপি রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র রাকেশ ত্রিপাঠী বলেছেন, 'মুলায়ম, রাজনাথ বা মায়াবতীর বাংলোয় তো এঘটনা ঘটেনি। অখিলেশ আসলে বাংলো হাতছাড়া হওয়ায় হতাশা চেপে রাখতে পারেননি। হতাশা থেকেই তিনি এই কাজ করেছেন।' এদিকে, এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এ ঘটনায় সকলেই অখিলেশেরই সমালোচনা করছেন।

চীনে ভারতীয় সিনেমার অভূতপূর্ব সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীনে ভারতীয় সিনেমার সাফল্য অব্যাহত। ভারতে রেকর্ড সৃষ্টি করার পর অক্ষয় কুমার ভূমি পেডনেকর অভিনীত 'টয়লেট : এক প্রেমকথা' ছবিটি সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে চীনে। মোট ১১,৫০০ প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি দেখানো হবে। চীনে কিছুদিন আগে প্রদর্শিত হিন্দি মিডিয়াম এবং বজরঙ্গী ভাইজানের থেকে যা অনেকটাই এগিয়ে। চিত্র সমালোচক তরণ আদর্শ জানিয়েছেন, চীনে প্রতিদিন ছবিটির ৫৬ হাজার শো হবে। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া বুঝে পরে তা ৫৮ হাজার করা হতে পারে বলে তিনি জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'টয়লেট : এক প্রেমকথা' মোদী সরকারের স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্পকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে। মেয়েদের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য প্রতিটি বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণ কতটা জরুরি, সেটাই ছবির বিষয়।

এক টুকরো ইতিহাস

রাজর্ষি সেনগুপ্ত

সিমলা ব্যায়াম সমিতি। প্রায় শতবর্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছনো উত্তর কলকাতার এই ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটি ভারতের মুক্তি আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটির জন্ম ১৯২৫ সালে। এর জন্মের পিছনে সেই সময়ের কিছু ঘটনা অনুঘটকের কাজ করেছিল। ১৯২৫ সালে উত্তর কলকাতায় একটি দাঙ্গা বাঁধে। উপলক্ষ্য, হ্যারিসন রোডে অবস্থিত দীন মিঞার মসজিদের সামনে দিয়ে আর্যসমাজীদের এক শোভাযাত্রার ওপর মুসলমানদের হামলা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায়, এমনকী ঠনঠনিয়া কালীবাড়িও আক্রান্ত হয়। এই সময় মন্দির রক্ষা করার জন্য নন্দলাল ঘোষ, জিষ্ণু বসু (নেড়াবাবু), অমর বসু প্রমুখের নেতৃত্বে সিটি কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররা এগিয়ে আসেন। দাঙ্গা মিটে যাওয়ার পর এই বাঙালি হিন্দু যুবকরা অনুভব করেন, হিন্দু বাঙালির সামনে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। এই সংকট থেকে যদি বাঁচতে হয়, তাহলে হিন্দু বাঙালিকে সংগঠিত হতে হবে এবং তাকে শরীরচর্চার দিকে নজর দিতে হবে। এই ভাবনা থেকেই অমরেন্দ্রনাথ বসু এবং নন্দলাল ঘোষের নেতৃত্বে সিমলা পাড়ায় একটি ব্যায়াম এবং কুস্তির আখড়া গড়ে ওঠে। সিমলা ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠার বীজ রোপিত হয়েছিল এভাবেই।

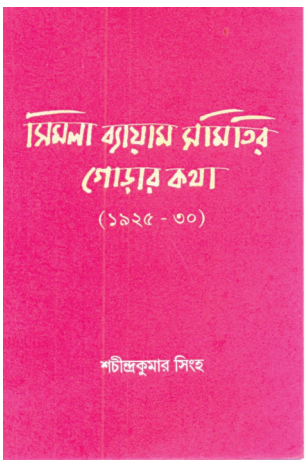

এইভাবে কিছুদিন বিভিন্ন জায়গায় ব্যায়াম চর্চা করার পর ১৯২৬ সালে ২ এপ্রিল পাকাপাকিভাবে একটি জায়গা নিয়ে সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠা হলো। ওইদিন বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে অতীন্দ্রনাথ বসু বীরাষ্টমী উৎসবের আয়োজন করেন এবং বিবেকানন্দ রোডের পাশে কিছুটা খোলা জায়গা কিনে নিয়ে সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম থেকেই চার-পাঁচ শো যুবক এবং ছাত্র প্রত্যহ এখানে লাঠিখেলা, কুস্তি এবং ব্যায়ামচর্চা শুরু করে। অচিরেই এই ব্যায়াম সমিতি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা এবং কর্মীদের একটি মিলন স্থল হয়ে দাঁড়ায়।

শচীন্দ্রকুমার সিংহ সিমলা ব্যায়াম সমিতির সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকেই জড়িত ছিলেন। জাতীয়তাবাদী শচীন্দ্রনাথ বাংলার মুক্তি আন্দোলনের সিমলা ব্যায়াম সমিতির অবদান লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁর লেখা সিমলা ব্যায়াম সমিতির গোড়ার কথা (১৯২৫-৩০) গ্রন্থে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের যোগসূত্রটি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি ওই সময়ের ইতিহাসের একটি লগ্নের আকর গ্রন্থ হিসাবেই বিবেচিত হবে।

এই গ্রন্থ থেকেই জানা যাচ্ছে, ১৯২৬ সালে সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গণে সর্বজনীন দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। কিন্তু এই পূজা নিছকই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল না। পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে এ ছিল শক্তির আরাধনা। প্রথম বর্ষের পূজামণ্ডপে রক্তাক্ষরে লেখা ছিল— 'রক্তাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন, তুলিয়া আনিব স্বাধীনতার ধন। সময় হয়েছে নিকট এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।'

অচিরেই অবশ্য এই ব্যায়াম সমিতির ওপর পুলিশের নজর পড়ে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর কলকাতাসহ অখণ্ড বাংলায় সবরকম সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে পুলিশ। সেই সময়ে কার্যত পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গণে সভা করেন। পুলিশ সেই সভায় হামলা চালাতে এলে অতীন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে সমিতির যুবকরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পুলিশ সমিতির সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। কিন্তু তাতেও সমিতির সদস্যদের দমন করা যায়নি। ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে সমিতির সদস্যরা শোভাযাত্রা বের করেন।

বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে সিমলা ব্যায়াম সমিতির বরাবরই একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপূজায় মাতৃবন্দনা করতে আসতেন। কলকাতার যুবকদের জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল এই ব্যায়াম সমিতি।

সম্প্রতি শচীন্দ্রকুমার সিংহের 'সিমলা ব্যায়াম সমিতির গোড়ার কথা' পুস্তকটি নতুন রূপে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশ করেছেন সূত্রধর এবং প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে যাঁরা কাজ করতে আগ্রহী— এই গ্রন্থটি তাঁদের রসদ জোগাবে।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির গোড়ার কথা (১৯২৫-৩০)। লেখক : শচীন্দ্রকুমার সিংহ।। প্রকাশক : সূত্রধর এবং প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ।। দাম : ৫০ টাকা।

LL.B (3 years) ভর্তির জন্য

সত্বর যোগাযোগ করুন।

যোগ্যতা : যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি / মাস্টার ডিগ্রি।

নম্বর সাধারণ	:	৪৫%
O.B.C.	:	42%
S.C. / S.T.	:	40%

এবছর বয়সের উর্ধ্বসীমা নেই।

চলভাষ : 9830854761

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

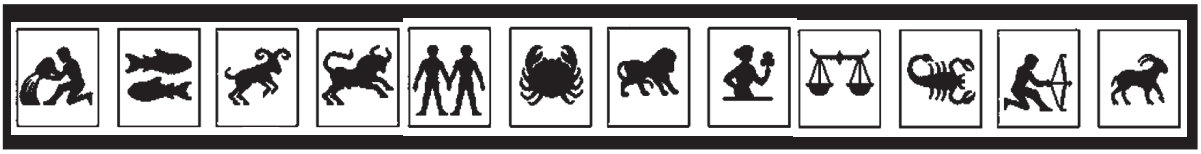

১৮ জুন (সোমবার) থেকে ২৪ জুন (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রবি-বুধ, কর্কটে শুক্র-রাহু, তুলায় বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে মঙ্গল এবং কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র সিংহে মঘা থেকে তুলায় বিশাখা নক্ষত্রে।

মেষ : দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে বৈষয়িক সমৃদ্ধি, সামাজিক প্রভাব ও পার্থিব সুখ বৃদ্ধি। লেখাপড়ায় উচ্চাভিলাষী হলেও বান্ধবীর কারণে মনোনিবেশের অভাব। সপ্তাহের মধ্যভাগে ফেসবুকে আগ্রহ বৃদ্ধি, সময়ের অপচয়, ও পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভে বাধা।

বৃষ : কর্মে বিশিষ্টজনের সহায়তা ও অতিরিক্ত দায়িত্ববৃদ্ধি। গবেষণা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। পরিসংখ্যানবিদ, আইনজ্ঞ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং ঔধধি, বস্ত্র ও গ্রহরত্ন ব্যবসায়ীদের বিত্ত ও শংসা প্রাপ্তি। ব্যবসার প্রসার। কর্মের যোগসূত্রে ভ্রমণ ও আর্থিক শুভ।

মিথুন : বিষয়-সম্পত্তি কেন্দ্রিক দীর্ঘদিনের মনোবাঞ্ছা পূরণের সম্ভাবনা। অংশীদারি ব্যবসায় যুক্ত ব্যক্তিদের সার্বিক শুভ। প্রণয়ে হতাশা। সন্তানের চলাফেরায় অস্বাভাবিকত্বের প্রকাশ। পারিবারিক অনুকূল পরিবেশ।

কর্কট : বাড়ির পরিবেশ, শরীর এবং ব্যবসায় বিনিয়োগে সতর্ক থাকা দরকার। চিন্তার স্বচ্ছতা, বহুমুখী কর্মদ্যোগ ও জগতের আনন্দযজ্ঞে সক্রিয় ভূমিকা ও মান্যতা। নব-নির্মাণ বা সংস্কার, সৃজনশীলতা, বিদেশযাত্রা, জ্ঞানান্বেষণ, ধন, সম্পদ, খ্যাতি, উচ্চপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুকুল সপ্তাহ।

সিংহ : পরিশ্রম অনুযায়ী প্রাপ্তির স্বল্পতা। ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। সহোদর অথবা দুর্জন প্রতিবেশী মানসিক বিভ্রান্তির কারণ। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিতে গর্ব ও আনন্দ, চর্ম-অস্থি ও বাতজ বেদনায় ভোগান্তি, উপযুক্ত চিকিৎসায় বিলম্ব।

কন্যা : অস্থিরচিত্ত, ফাটকায় ক্ষতি, অবাঞ্ছিত ব্যয়। আত্মীয় সমাগম ও ব্যবসায় নব দিগন্তের শুভ সূচনা। বিদার্থী, গবেষক প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের বহুমুখী কর্মের স্বীকৃতি ও শংসা প্রাপ্তি। স্ত্রী ও কন্যার পরামর্শে আর্থিক বৃদ্ধির সহায়ক। ভ্রমণে আনন্দ ও সুখ।

তুলা : পারিবারিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সুজন সমাগম ও সম্পর্কের উন্নতি। স্ত্রীর জেদ সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধির কারণ। খনিজ ও জলজ দ্রব্যের ব্যবসায় ধনার্জনের ক্ষেত্রে প্রশস্ত। বয়স্কদের স্বাস্থ্যের উন্নতি, উৎফুল্ল মন। গুরুজনে শ্রদ্ধা, দয়ার্দ্রহৃদয় ও পেশাগত দক্ষতা ও দায়িত্ববৃদ্ধি।

বৃশ্চিক : বিলাসী ও নির্দয়ভাবের প্রকাশ। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ ও রমণীর সান্নিধ্যেলাভ। পুরাতন গৃহের সংস্কার ও মাতার স্বাস্থ্যোন্নতি। কর্মকুশলতায় দায়িত্ব বৃদ্ধি, সহকর্মীর ঈর্ষার কারণ। একাধিক উপায়ে অর্থাগম। বিদ্যার্থী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজ্ঞের বহুমুখী কর্মপ্রয়াসে সাফল্য ও স্বীকৃতি।

ধনু : নিজ দক্ষতায় পদোন্নতি ও স্থানান্তরের সম্ভাবনা। গুরুজনে শ্রদ্ধা, দেব-দ্বিজে ভক্তি, উদারতা, স্বজন বাৎসল্য, স্বাভিমান ও সৃষ্টির আনন্দে ভরা মন। অংশীদারি ব্যবসায় বিনিয়োগে ইতিবাচক ফল। সপ্তাহের শেষভাগে উচ্চস্থান থেকে পড়ে আঘাতের সম্ভাবনা।

মকর : শরীরের যত্নের প্রয়োজন। আয়ের শ্লথ গতি। গৃহ-সম্পত্তি বিবাদে নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সমালোচনা, জটিলতা, কর্মপরিবর্তন যোগের প্রভূত সম্ভাবনা, ছলনাময়ীর কারণে সম্ভ্রমহানি। সপ্তাহের প্রান্তভাগ বিদ্যার্থী, চিত্রসাংবাদিক, শিল্পী, কলাকুশলীদের শ্রী ও সমাদর লাভ।

কুম্ভ : বেকারদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। খেলোয়াড়, সেনাধ্যক্ষদের বুদ্ধি ও নৈপুণ্যে বিজয়ীর সম্মান। পরিবারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির যোগ। স্ত্রী অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক, বহুমুখী কর্ম প্রয়াস ও একাধিক উপায়ে উপার্জন। গুণী ও সুধীজনের সান্নিধ্য ও আশীর্বাদ লাভ।

মীন : বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি, বিত্ত ও অভিজাত্য গৌরব। ধর্ম-কর্ম, শাস্ত্রীয় জ্ঞান আহরণের সার্থক প্রচেষ্টা। সরলতা, স্নেহপ্রবণতায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও সৃষ্টির আনন্দে মগ্নতা ও স্বচ্ছন্দ পদচারণা।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

শ্রী আচার্য্য